প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৩ ❖ ১৮ - ২৪ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

পুনরুত্থান পর্বের অর্থ
এবং পরিত্রাণদায়ী তাৎপর্য

সর্বজনীন উৎসব : প্রেক্ষাপট, বাংলা নববর্ষ

আমাদের সংস্কৃতি ও
বাংলা নববর্ষ

বিদায়ের প্রথম বছর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত বার্ণাড জীবন বিশ্বাস
জন্ম : ৬ অক্টোবর, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ (বরিশাল)
মৃত্যু : ১৫ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ (ঢাকা)

"শান্তি, মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ,
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ।"

সময়ের আবর্তে ফিরে এলো সেই বেদনাবিধুর দিনটি ১৫ এপ্রিল, যেদিন তুমি আমাদেরকে ছেড়ে স্বর্গীয় পিতার কোলে চিরকালের মত আশ্রয় নিয়েছ। তোমার অনুকরণীয় কৃতকর্ম ও গুণাবলীর মধ্যদিয়ে তুমি ছিলে, তুমি আছ এবং তুমি থাকবে আমাদের হৃদয় মন্দিরে। স্বর্গধাম হতে তুমি পরম পিতার কাছে যাচ্না কর, যেন আমরা তোমার অতি সাধারণ, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ন এবং পবিত্র জীবনের অনুসারী হতে পারি।

তোমারই শোকাহত
স্ত্রী : ন্যান্সি প্রভা বিশ্বাস
এবং
একমাত্র সন্তান : প্যাট্রিক উজ্জল বিশ্বাস

বিজ্ঞ/১০৯/২১

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!
প্রতিবেশী প্রকাশনী'র নতুন বছরের বই সম্ভার

প্রতিবেশী প্রকাশনী সমসাময়িক বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের বই প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রতিবেশী প্রকাশনী বই প্রকাশে এক উজ্জ্বল সময় অতিবাহিত করছে যা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্যে শুভ বারতা বহন করে।

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

বইগুলোর প্রাপ্তিস্থান

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় মূর্তি, ক্রুশের পথের ছবি (ফাইবার) প্রতিবেশী প্রকাশনী সরবরাহ করে থাকে।
আপনার প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন। – প্রতিবেশী প্রকাশনী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ১৩
১৮-২৪ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
৫-১১ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজন : সচেতনতা ও ঐশ করুণা

করোনাভাইরাসের কারণে অনেকদিন ধরেই বিশ্ব, বিশেষভাবে বাংলাদেশ ক্রান্তিকালের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে এই ভাইরাসের বিষাক্ততা যেন আরো তীব্র হচ্ছে। ভাইরাস বিষবাষ্পের সাথে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের কোন্দল ও সরকারবিরোধী অবস্থান। কিন্তু কেন এমনটা হচ্ছে? এরূপ সংকটময় অবস্থা সৃষ্টিকল্পে কারা ভূমিকা পালন করছে? এ ব্যাপারে সকল নাগরিককে যথার্থভাবে চিন্তা করে দুর্বলতা আবিস্কার করতে হবে। করোনাভাইরাসের ১ম ধাক্কা সামলানোর জন্য বাংলাদেশ খুব একটা প্রস্তুত ছিল না। অন্যভাবে বলা যায়, প্রস্তুতি একটু দেরিতে শুরু হয়। কিন্তু দেরিতে হলেও সরকার ও প্রশাসনের কঠোর অবস্থানে সাধারণ জনগণ অনীহা সত্ত্বেও লকডাউনে থেকে করোনা সংক্রমনের প্রাথমিক ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি ততটা ভয়াবহ হয়নি যতটা ভাবা হয়েছিল। তারপরও শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতেও করোনার আঘাত অব্যাহত থাকে। সরকারের দূরদর্শি পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তে অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়াবার একটি সম্ভাবনা তৈরি করতে যাচ্ছিল বাংলাদেশ।

জীবিকা নির্বাহের জন্য আমরা ধীরে ধীরে জীবনকেই হুমকির মুখে ফেলে দিতে থাকি। করোনা নিয়ন্ত্রণে না এনেই আমরা স্বাভাবিকভাবে দৈনন্দিন জীবনের সবকিছু করতে থাকি। এমনিতর অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে ত্বরিৎ টিকা সংগ্রহ এবং বিনা মূল্যে তা বিতরণ করা সত্যিকারভাবেই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু শুধু টিকার মধ্যদিয়েই তা নির্মূল করা সম্ভব নয় বললেও স্বাস্থ্যবিধি পালনে সরকার কঠোরতা না দেখানোর কারণে অসচেতন এই আমরা করোনা বিস্তারে সহায়কের ভূমিকা পালন করছি।

বিগত কিছু মাসে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান স্বাভাবিকধারাতে করাতে করোনাভাইরাসের ২য় ঢেউ বেশ ঝেঁকে বসেছে এখন। আমাদের চলাচল, উৎসব-উদ্‌যাপন খুব নিয়ন্ত্রিতভাবে করলে করোনার সংক্রমকও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকতো বলে মনে হয়। করোনার উর্ধ্বগতি কালে বইমেলা, বাংলাদেশ গেমস ইত্যাদি আয়োজন না করলেই ভালো হতো। করোনাভাইরাসের টিকা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে না দিয়ে অল্পকিছু মূল্য নির্ধারণ করে তা দিলে যে টাকাটা আসতো তা দিয়ে আরো বেশি টিকা আমদানি করা যেত। অধিকন্তু বিনামূল্যে কিছু পেলে তা অনেকেই মূল্য দিতে চায় না। তবে করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন কর্ম উদ্যোগ প্রশংসা পেলেও বিফল হচ্ছে আমাদের অসচেতনতার জন্য। তাই প্রথমেই জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং অসচেতনকে চেতনা দান করতে কঠোর হতে হবে।

এ বছর ১৪ এপ্রিল বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ আনন্দ-উচ্ছাসে নয়, কিন্তু সকলের মঙ্গল কামনায় পালিত হবে। বাঙালির জীবনে বৈশাখ একটি অনন্য বার্তা নিয়ে আসে। বিগত জীবনের দীনতা, হীনতা ও জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে নতুন করে উদ্যমী হওয়ার আহ্বান জানায় বৈশাখ। দুঃখ-কষ্ট, বেদনাকে মুছে ফেলে নতুন করে বাঁচার নির্দেশনা দেয়। করোনা আমাদের জীবনে অনেক মৃত্যু, দুঃখ-বেদনা সৃষ্টি করেছে। নববর্ষের আশীর্বাদ হয়ে সচেতনতা আসুক সবার জীবনে। সচেতন হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনাকে নিজে জয় করবো এবং অন্যকেও জয় করতে সহায়তা করবো। করোনা ভীতিতে জবুথবু হয়ে বসে না থেকে সকলের প্রয়োজনে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়ে দয়া বা করুণার আদর্শ তুলে ধরি। মনে এই সাহস রাখি যে, পুনরুত্থিত যিশু আমাদের সকলের প্রতি করুণা করছেন। ঐশ করুণা নিজ জীবনে উপলব্ধি করে দয়াময় হয়ে ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার। যিশুর দয়া ও ভালবাসা নিয়ে এই করোনাকালে বাংলাদেশ মণ্ডলী যিশুর দয়া ও ভালবাসা অন্যদের সাথে প্রকাশ করবে আর জগতকে খ্রিস্টের আলোতে আলোকিত করবে॥ †

যিশু তাঁকে বললেন, "আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।"
- (যোহন ২০:২৯)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

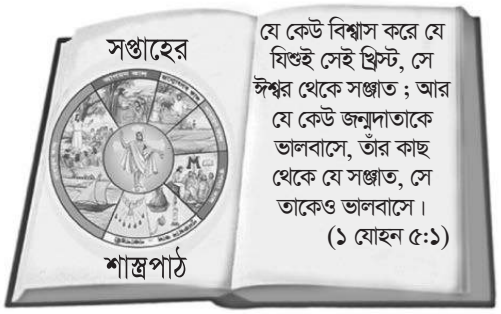

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৮ - ২৪ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৮ এপ্রিল, রবিবার
শিষ্যচরিত ৩: ১৩-১৫, ১৭-১৯, সাম ৪: ২, ৪, ৬খ-৭, ৯, ১ যোহন ২: ১-৫, লুক ২৪: ৩৫-৪৮

১৯ এপ্রিল, সোমবার
শিষ্যচরিত ৬: ৮-১৫, সাম ১১৯: ২৩-২৪, ২৬-২৭, ২৯-৩০, যোহন ৬: ২২-২৯

২০ মঙ্গলবার
শিষ্যচরিত ৭: ৫১-- ৮: ১ক, সাম ৩১: ২গঘ, ৩, ৫, ৬খ, ৭ক, ১৬, ২০কখ, যোহন ৬: ৩০-৩৫

২১ এপ্রিল, বুধবার
শিষ্যচরিত ৮: ১খ-৮, সাম ৬৬: ১-৩ক, ৪-৭ক, যোহন ৬: ৩৫-৪০

২২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
শিষ্যচরিত ৮: ২৬-৪০, সাম ৬৬: ৮-৯, ১৬-১৭, ২০, যোহন ৬: ৪৪-৫১
বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী।

২৩ এপ্রিল, শুক্রবার
শিষ্যচরিত ৯: ১-২০, সাম ১১৭: ১-২, যোহন ৬: ৫২-৫৯

২৪ এপ্রিল, শনিবার
শিষ্যচরিত ৯: ৩১-৪২, সাম ১১৬: ১২-১৭, যোহন ৬: ৬০-৬৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৯ এপ্রিল, সোমবার
+ ১৯৮৯ সিস্টার মেরী চার্লস, এমসি
+ ২০০১ সিস্টার নমিতা গমে সিএসসি (ঢাকা)

২০ এপ্রিল, মঙ্গলবার
+ ১৯০০ সিস্টার এম. মিলড্রেড অব যীজাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯২৬ সিস্টার এম. টমাস বেকেট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯২৬ সিস্টার এম. আলফন্স আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫৮ সিস্টার এম. আন্ড্রেয়ান এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৪ সিস্টার ফের্দিনান্দো মুর্মু সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯১ সিস্টার এম. মেডোলিন উইস আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০০২ ফাদার আলফ্রেড পুণ্য বিশ্বাস (খুলনা)
+ ২০১১ সিস্টার মেরী লুসী পিসিপিএ
+ ২০১৩ সিস্টার মেরী আলফন্সা পিসিপিএ
+ ২০১৪ সিস্টার মেরি রোজ এসএমআরএ

২১ এপ্রিল, বুধবার
+ ১৯২৬ সিস্টার ভিক্টর, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৭১ ফাদার লুকাশ মারান্ডী (দিনাজপুর)
+ ১৯৮১ আর্চবিশপ গ্রেনার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ সিস্টার জর্জ প্রেতে সিএসসি
+ ১৯৯২ ফাদার. উইলিয়াম টিলসন, এমএম
+ ২০০৪ সিস্টার এম. আদল্ফ হাজং আরএনডিএম (ঢাকা)

২২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯১ সিস্টার হেলেন কস্তা আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০০১ সিস্টার মেরী বার্নাডেট এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৮ ফাদার জর্জ পোপ সিএসসি (ঢাকা)

২৪ এপ্রিল, শনিবার
+ ১৯২৩ ফাদার চার্লস এল. ফিননার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৯ ফাদার সেরাফিনো দোল্লা ভেক্কিয়া এসএক্স (খুলনা)

মধ্যবিত্ত সমাজ প্রসঙ্গে কিছু কথা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী চলার পথে ৮১ বছর ০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত "মধ্যবিও সমাজ" লেখাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণসহ চিন্তাভাবনার বহিপ্রকাশে আলবেনুস সরেন ভাইকে আন্তরিক ভালোবাসাসহ সমবায়ী অভিনন্দন জানাই।

ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়, বিদেশী খ্রিস্টান মিশনারীগণ আমাদের দেশে ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নে স্কুল-কলেজ এবং অভাবী মানুষের দারিদ্র বিমোচনে খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। পবিত্র শাস্ত্রের বচন : শস্য ক্ষেত্রে কিছু আগাছা জন্মাবে এবং মাছের খামারে কিছু রাক্ষসী মাছ থাকবে। সুতরাং শ্রেণীভেদ দোষারোপ করে সুফল পাওয়া যাবে না।

চলার পথে পানির পিপাসায় এক বাড়ীতে ঢুকে বৃদ্ধাকে দেখতে পেয়ে যিশু প্রণাম বলে খাওয়ার জন্য এক গ্লাস পানি চাওয়া মাত্র তার ছোট বৌ মাকে গ্লাস পরিষ্কার করে পানি আনতে বলে। বৌমা সাবান দিয়ে গ্লাস পরিষ্কার করতে গেলে পিছলিয়ে তা হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে যায়। ঝাড়ু দিয়ে মিটসেফের নিচে সরিয়ে রেখে অন্য গ্লাসে পানি এনে দেয়। বড় বৌমার ৭/৮ বছরের ছেলের উৎপাতে তার রান্না ঘরে ঢোকার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও ঠিক ঐ সময়ে সে দৌড়ে ঘরে ঢোকায় বৃদ্ধার নজরে পড়ে। বৃদ্ধা নাতিকে ধরতে ঘরে ঢোকার সময় মিটসেফের নীচে ভাঙ্গা গ্লাসের টুকরো দেখতেই রাগান্বিত স্বরে বলে, তোকে এই ঘরে আসতে বারণ করেছি, সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করিস বললেই কান ধরে গালে এক থাপ্পর মারে। ছেলের কান্না শুনে বড় বৌমা আসলে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা আমি গ্লাস ভাঙ্গিনি, ঠাকুমা আমাকে মেরেছে। সবকিছু শুনেও ছোট বৌমা চুপ থাকায় সুখী পরিবারে মত-বিরোধে শুধু অশান্তি নয় নানাবিধ অভিযোগ পূর্ণ সমস্যায় জড়িয়ে বিভক্ত হলেই ধনী শ্রেণী সুযোগ বুঝে ফায়দা লুফে নেয়, এখানেই সমস্যা।

খ্রিস্টভক্ত হিসাবে "প্রতিবেশীকে ভালবাস" কথা স্মরণে একত্রে আলোচনায় বসে সত্য কথা প্রকাশে ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে ভুল-ত্রুটি সংশোধন ও পুণঃমিলনে সমাজ উপকৃত হবে। আদরের সন্তানদের "মিথ্যা কথা বলিব না" কথাটি নিয়মিত শিক্ষাদানে ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে। কেননা "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড" বিবেচনায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে সুনাগরিক হিসাবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হলে ঈশ্বরের আশীর্বাদে সমাজ ব্যবস্থায় অনেকাংশে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

পিটার পল গমেজ
সমবায়ী মাঠ কর্মী

বিশেষ ঘোষণা

সরকার ঘোষিত লকডাউন (১৪ - ২১ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ) থাকায় সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র আগামী সংখ্যা অনলাইনে প্রকাশিত হবে; যা পরবর্তী সময়ে যথারীতি ছাপানো হবে।
পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র ওয়েব পেইজ ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে জানানো হবে।

- সম্পাদক

ফাদার টিটু ডেভিড গমেজ

পুনরুত্থান কালের ৩য় রবিবার

১ম পাঠ : শিষ্যচরিত ৩:১৩-১৫, ১৭-১৯
২য় পাঠ : ১ যোহন ২:১-৫
মঙ্গলসমাচার: লুক ২৪:৩৫-৪৮

দুই বন্ধু ছিল এবং তারা ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তবে প্রথম বন্ধু ছিল খ্রিস্ট বিশ্বাসি এবং দ্বিতীয় বন্ধু খ্রিস্ট বিশ্বাসি ছিল না। তাই একদিন দ্বিতীয় বন্ধু প্রথম বন্ধুকে বলল:

দ্বিতীয় বন্ধু: বন্ধু তুমি তো খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেছ এবং গ্রহণও করেছ। তাই তোমারে একটি পরীক্ষা নিতে চাই। বল দেখি যিশু কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

প্রথম বন্ধু: আমার জানা নেই।

দ্বিতীয় বন্ধু: যিশু কত বছসর বয়সে মারা গেলেন?

প্রথম বন্ধু: আমি জানি না।

দ্বিতীয় বন্ধু: যিশু কতগুলি উপদেশ দিয়েছিলেন?

প্রথম বন্ধু: আমি সত্যিই জানি না।

দ্বিতীয় বন্ধু: আমি অবাক হচ্ছি যে কিভাবে এত কম জেনে তুমি খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেছ এবং তাকে গ্রহণও করেছ।

প্রথম বন্ধু: আমি সত্যই দুঃখিত ও লজ্জিত যে যিশু খ্রিস্ট সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই কম। তবে আমি যা জানি তা আমি অবশ্যই তোমার সাথে সহভাগিতা করব এবং তোমাকে জানাতে চাই। একসময় আমি কঠিনভাবে মাদকাসক্ত ছিলাম। আমি এবং আমার পরিবার দেনায় ডুবে গিয়েছিল। প্রতি সন্ধ্যায় আমি যখন নেশা করে বাড়ি ফিরতাম তখন আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা আতঙ্কে থাকত। এখন আমি নেশা মুক্ত। আমার কোন দেনা নেই। আমরা এখন সুখি পরিবার। প্রতি সন্ধ্যায় এখন আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকে কখন আমি বাড়ি ফিরব। তুমি জান! এই সবই সম্ভব হয়েছে যিশুরই জন্য।

'পথে কী-কী ঘটেছিল, আর কীভাবে সেই রুটি-ছেড়া দেখেই তারা যিশুকে চিনে ফেলেছিলেন, দু'জন শিষ্য তখন সেই সব কথা সকলকে শোনাতে লাগলেন। তারা বলে চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ যিশু নিজেই শিষ্যদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন ... তোমরাই এই সব কিছুর সাক্ষী রইলে *(লুক ২৪:৩৫,৩৬,৪৮)*।

খ্রিস্টের পুনরুত্থানের আজ তৃতীয় সপ্তাহ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের প্রত্যেকেই খ্রিস্টের সাক্ষী হতে হবে এবং আমাদের সাক্ষ হবে আমরা যা অভিজ্ঞতা করেছি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সঙ্গে। আমি যদি খুব ভাল একটি ছবি দেখি এবং তা যদি কারো সাথে সহভাগিতা না করি তবে কিইবা লাভ হল। আমি যদি সবার আগে খুব ভাল একটা সংবাদ পাই তাতে কিইবা লাভ হবে যদি আমি তা আর অন্যকে না বলি। আমার যদি খুব বড় অভিজ্ঞতা থাকে কিন্তু কারো সাথে সহভাগিতা না করি তবে কিইবা লাভ হবে। তাই এই রবিবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে চল্লিশদিন প্রায়শ্চিত্তকাল পার করার পর পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে যে অভিজ্ঞতা করেছি আমরা যেন তা অন্যের সাথে সহভাগিতা করি। তাই আজকের মঙ্গলসমাচার বলছে ... তোমরাই এই সব কিছুর সাক্ষী রইলে *(লুক ২৪: ৪৮)* এবং প্রথম পাঠ বলছে ... আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী *(শিষ্য ১৩:১৫)*।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে একজন সাক্ষী হিসেবে জগতের কাছে আমরা কিইবা সাক্ষ্য দিব? খুবই সোজা - মন পরিবর্তন এবং পাপের ক্ষমা। জন্ম থেকে খোড়া এক ভিখারীকে সুস্থ করার পর যখন লোকেরা পিতরের কাছে ছুটে আসছিল তখন পিতর যেমনটি লোকদের বলেছিলেন, 'তোমরা এখন মন ফেরাও, ফিরেই এসো, তোমাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যাক *(শিষ্য: ৩:১৯)*। আমরাও যখন খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করি আমাদেরও সাধু পিতরের মত পাপের ক্ষমার ও মন পরিবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কারণ যিশু এই পাপ থেকে মুক্ত করতেই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমরা যদি পাপের অবস্থায় রয়ে যাই তবে আমরা বারবারই যিশুকে ক্রুশেবিদ্ধ করি আমাদের পাপ দ্বারা।

অন্যকে আমি কিভাবে পাপের ক্ষমার কথা বলতে পারব যদি আমি নিজেই পাপের মধ্যে ডুবে থাকি? অন্যকে আমি কিভাবে সুস্থ করব যদি আমি নিজেই সুস্থ না থাকি। অন্যকে আমি কিভাবে পথ দেখাব যদি আমি নিজেই পথ না জানি বা চিনি। অন্যকে আমি কিভাবে স্বর্গের কথা বলল যদি আমার জীবন-যাপনই মন্দ হয় বা খারাপ হয়। আর এটাই হচ্ছে যেন বর্তমানে খ্রিস্টমণ্ডীতে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই ব্যাপারটা যেন অনেকটা এই রকম - আমাদের সমাজে আজ কথা বলার অনেক লোক আছে কিন্তু কাজ করার লোক যেন খুবই কম, অনেক মণ্ডলী আছে কিন্তু সত্য উপাসক যেন অনেক কম, অনেক খ্রিস্টভক্ত আছে কিন্তু খ্রিস্টের সাক্ষী যেন খুবই কম। আর তাই আদিমণ্ডলী যেভাবে বিকশিক হয়েছিল বর্তমান মণ্ডলী যেন সেভাবে বিকশিত হতে পরছে না।

আজকের প্রথম পাঠে পিতর বলছে যে আমি অবশ্য জানি, ভাই তোমরা যা করেছ তা না বুঝেই করেছ, আর তোমাদের নেতারাও তাই করেছে। ২য় পাঠে সাধু যোহন দেখিয়ে দিচ্ছে যে কেউ কেউ আছে যারা মনে করে যে তারা ঈশ্বরকে জানে আসলে তারা ঈশ্বরকে জানেই না। আবার মঙ্গলসমাচার বলছে যে যিশু শিষ্যদের মাঝে এসে দাড়ালেন আর তারা মনে করছে ভুত, তারা যিশুকে দেখছে কিন্তু চিনতে পারছে না। ব্যাপারগুলি দেখে মনে হচ্ছে অনেকটা যেন খাপছাড়া এবং এলোমেলো। এসবের অর্থ কী? ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না। আসলে সবকিছু আমাদের মানবীয় জ্ঞান ও চোখ দিয়ে দেখে বুঝা যায় না, আর তাই দরকার হয় ঐশ্বরিক আলো বা অনুপ্রেরণা। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে শিষ্যরা এতদিন যিশুর সঙ্গে ছিল অথচ আজ তারা যিশুকে দেখেও চিনতে পারছে না? আসলে আমরা সবকিছু মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা চোখ দিয়ে দেখতে ও বুঝতে পারি না। দারকার ঐশ্বরিক আলো। ঐশ্বরিক আলো হচ্ছে সেটাই যা আমাদের মানবিয় বিষয়ের উর্ধ্বে উঠে আমাদের আলোকিত করে। আমারা যখন শুধু মানবিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করি তখন ভুল করতেও পারি যেমন শিষ্যরা তাদের মানবীয় চোখ দিয়ে দেখেও যিশুকে চিনতে পারেনি। আর তাই যিশুকে চিনার জন্য তাদের আধ্যাত্মিক চোখের প্রয়োজন ছিল। এর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে ১ম সামুয়েল ১৬ অধ্যায়। সামুয়েল জেসের বাড়িতে প্রেরিত হয়েছিল দায়ূদকে অভিষিক্ত করতে। কিন্তু সামুয়েল জেসের প্রথম পুত্রের বাহ্যিক অবয়ব দেখেই মনে মনে ভাবল যে ঈশ্বর মনে হয় একেই মনোনিত করেছেন অভিষিক্ত করার জন্য। ঈশ্বর কিন্তু বললেন যে আমি মানুষের মুখ নয় বরং অন্তরটাই দেখি। শেষে সামুয়েল জেসের শেষ সন্তান দায়ূদকে অভিষিক্ত করলেন। এখানে সামুয়েল ভুল করতে পারত যদি তিনি শুধুই মানবিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করত। তেমনিভাবে যিশুকে চেনার জন্য আমাদেরও দরকার ঐশ্বজ্ঞান, আলো ও প্রেরণা।

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট শিষ্যদের মাঝে উপস্থিত হলেন কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না। তখন যিশু মোশীর বিধান-গ্রন্থে, প্রবক্তদের বাণী-গ্রন্থে ও সামসঙ্গীতে তার সমন্ধে যা-কিছু লেখা ছিল সমস্তই বললেন এবং এও বললেন যে শাস্ত্রে তো লেখাই আছে যে তিনি যন্ত্রণাভোগ করবেন এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হবেন। এবার শিষ্যদের চোখ খুলে গেল তারা শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে পারলেন এবং যিশুকেও চিনতে পারল। যিশুকে চিনতে হলে, আমাদের অন্তরের চোখকে আলোকিত করতে হলে অবশ্যই ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করতে হবে এবং তা পালনও করতে হবে। তাই সাধু জেরম বলে, "বাইবেল বা শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা হচ্ছে খ্রিস্ট সম্বন্ধে অজ্ঞতা"।

আবার দেখি যে শিষ্যরা যখন যিশুকে না চিনে ভূত মনে করল তখন তিনি তাদের কাছ থেকে এক টুকরো ভাজা মাছ সবার সামনেই খেয়ে ফেললেল। এটা যিশু যেন তাদেরকে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাচ্ছেন যে তোমাদের কি মনে নেই কয়েক টুকরো মাছ ও রুটি দিয়ে আমি কত-শত লোককে খাইয়েছি। এই খাওয়ার মধ্যেদিয়েই যিশু তাদের স্মরণ করিয় দিচ্ছেন শেষ ভোজের কথা যেখানে তিনি রুটি ও দাক্ষারস দিয়ে বলেছিলেন নিজের দেহ ও রক্ত এবং তার স্মরণে তা করার নির্দেশও দিয়ে গিয়েছিলেন। এসবের মধ্যদিয়েও যিশু তাদের অন্তরকে আলোকিত করলেন।

আমাদের অন্তরকেও আমরা আলোকিত করতে পারব ও যিশুকে চিনতে পারব পবিত্র খ্রিস্টযাগে কারন পবিত্র খ্রিস্টযাগ হচ্ছে এমন এক জায়গা যেখানে প্রভুর বাণী ঘোষণা করা হয় এবং তা ব্যাখ্যাও করা হয়। আমরা যতই খ্রিস্টযাগে যোগদান করব ততই বাণী সম্বন্ধে অধিক জানতে পারব এবং আলোকিত হত পারব। এই বাণীর মাধ্যমে এবং বাণীর আলোয় যিশুকে চিনতে পারব। পবিত্র খ্রিস্টযাগ হচ্ছে এমন এক স্থান যেখানে রুটি ও দাক্ষারস যিশুর দেহে ও রক্তে রূপান্তরিত হয়। পুনরুত্থিত যিশু উপস্থিত এই খ্রিস্ট প্রসাদে।

তাই আজকের মঙ্গলসমাচার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে যিশু সত্যই জীবিত এবং সক্রিয়। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট শারীরিকভাবে অনুপস্থিত কিন্তু তিনি উপস্থিত রুটিছেড়া অনুষ্ঠান বা পবিত্র খ্রিস্টযাগে। তিনি উপস্থিত আছেন তার বাণী ও সংস্কারের মধ্যে। তিনি উপস্থিত আমাদের জীবনের সমস্যা ও কঠিন সংকটের সময়ও। আমরা প্রায়ই অন্ধ হয়ে যাই আমাদের সমস্যা দ্বারা এবং সেই মুহূর্তে আমরা যিশুকে চিনতে পারি না বরং যিশুকে দেখে মনে হয় ভূত বা শয়তান। যিশু আজ শিষ্যদের দেখা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি জীবিত এবং সবসময় তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন। আমরাই হলাম সেই জীবিত যিশুর সাক্ষি এবং এই সাক্ষ্য যেন সারা পৃথিবীতে বয়ে নিয়ে যেতে পারি॥

পুনরুত্থান পর্বের অর্থ এবং পরিত্রাণদায়ী তাৎপর্য

সিস্টার মেরী পালমা আরএনডিএম

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্ব, খ্রিস্টভক্তদের ধর্মীয় পর্বগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি পর্ব। পুনরুত্থান পর্বকে "ইস্টার পর্ব বা খ্রিস্টিয় নিস্তার উৎসব" পর্বও বলা হয়। এই পর্বে মিশর দেশের ফৌরণ রাজার বন্দিত্ব ও দাসত্ব হতে ইহুদীজাতির মুক্তির ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য, খ্রিস্টভক্তগণ পুনরুত্থান পর্বকে **"পাস্কা পর্বও"** বলে থাকে। যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের অর্থ: 'মানবজাতির সমস্ত পাপের দাসত্ব ও বন্দিত্ব হতে মুক্তি ও ঐশজীবনে উন্নীত হওয়া'।

প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। যথা:- **(১)** ঐতিহাসিক, **(২)** আধ্যাত্মিক অর্থে ঈশ্বরের সাথে মিলনের রহস্য, **(৩)** জগতের শেষ দিন বা অন্তিম দিন ও পুনরুত্থান।

(১) ঐতিহাসিক গুরুত্ব: যিশু খ্রিস্ট ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়ে ও স্থানে জন্মগ্রহণ, জীবন-যাপন ও প্রচার কাজ করেছেন। বিশেষভাবে তিনি দরিদ্রদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। বজ্রকণ্ঠে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন বলে ও তাঁর সময়ের ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থপর সমাজ নেতাদের অন্যায় ইচ্ছা মেনে নেননি বলেই, তাঁকে ক্রুশের লজ্জাজনক মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে তিনি ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুর পর মাত্র তিন দিন তিনি করবে থেকেছেন। কিন্তু তৃতীয় দিনে মৃত্যুকে জয় করে, 'সগৌরবে ও মহিমায়' পুনরুত্থান করেছেন। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান কোন কাল্পনিক ব্যাখ্যা নয়। যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান এর সাথে মানুষের মুক্তির রহস্য নিবিড়ভাবে জড়িত। প্রভু যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান মানুষের পরিত্রাণের যজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। যুগ যুগ ধরে এই একই শিক্ষা খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ বংশানুক্রমে দিয়ে যাচ্ছেন। যা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে বা নবসন্ধিতে, "মানব পুত্রকে একদল পাপী মানুষের হাতে সমর্পিত হতে হবে; তাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে, তারপর তৃতীয় দিনে তাকে পুনরুত্থানও করতে হবে।" তিনি কিন্তু সত্যই পুনরুত্থিত হয়েছেন"-*(মার্ক: ১৬:১-৮, ১০-১১; লুক: ২৪: ১-৯; যোহন: ২০:১৭)*।

তাই, যিশুর পুনরুত্থান একটি সত্য ও বাস্তব ঘটনা। যার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখেছি, পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে। সাধু পল অন্যান্য বার জন শিষ্যদের ন্যায় পুনরুত্থিত যিশুকে দেখেছেন। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে অনেক বাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। যেমন: করিন্থীয় লোকদের কাছে, তিনি লিখেছেন, "আমার নিজের কাছে যে বাণী সম্প্রদান করা হয়েছিল, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাণী হিসেবেই তোমাদের কাছে তা সম্প্রদান করেছি।" আর সেই বাণী হলো, "খ্রিস্ট মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থিত হয়েছেন! মৃত্যুবরণ করে তিনি মৃত্যুকে জয় করে, মৃতদের তিনি নতুন জীবন দিয়েছেন।" "আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, **তিনি** যিশুকে পুনরুত্থান করে, আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন।" তাই, যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান খ্রিস্টভক্তদের বিশ্বাসের মূলকেন্দ্র। *(১পিতর: ১:১-৮; গালাতীয়: ৩:২৭; ২করিন্থীয় ৫:১৫-১৬; কলসীয়: ২:১২-১৩)*।

(২) আধ্যাত্মিক ও ঈশ্বরের সাথে মিলনের রহস্য: আদম-হবার পাপের ফলে, মানব জাতি ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। 'মানুষের পতনের পর ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করেননি'। ঈশ্বর আদম-হবা অর্থাৎ মানবজাতির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, প্রতিশ্রুতির কালপূর্ণ হলে, পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তিকে (যিশুকে) মানবাকারে এই পৃথিবীতে পাঠাবেন। যাতে, 'তিনিই (যিশু) নিজ জনগণকে তাদের পাপের দাসত্ব হতে মুক্ত করবেন।' ঈশ্বরের সাথে ঐশজীবনে অংশী ও সহভাগিতা করার যোগ্য করে তুলবেন। তাইতো, সাধু পল গালাতীয়বাসীদের নিকট লিখেছেন: "খ্রিস্টের সংগে আমি এখনও ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছি। তাই, এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নই; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্টই জীবিত আছেন। ... পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আমি তো ব্যর্থ করে দেই না ।" *(গালাতীয়: ২:২০-২১)*। যিশু খ্রিস্টের জন্ম, কাজ, বিশেষ করে তাঁর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের রহস্য, খ্রিস্টভক্তদেরও রহস্য।

(৩) জগতের শেষ বা অন্তিম দিন ও পুরুত্থান: যিশু খ্রিস্ট যেমন তাঁর দেহ নিয়ে পুনরুত্থিত হয়েছেন; তেমনি জগতের শেষ দিনে, সব মানুষও তাদের দেহ-নিয়েই পুনরুত্থান করবে এবং প্রত্যেকের কাজ অনুসারে ঈশ্বরের নিকট হতে পুরস্কৃত হবে। যারা ভালো কাজ ও পবিত্র জীবন-যাপন করে, সে সব মানুষ, তাঁর সঙ্গে অনন্ত-কাল ধরে বসবাস করবে। আর যারা পাপের অবস্থায় জীবন-যাপন করে; তারা ঈশ্বরেরর সান্নিধ্য চিরকালের জন্য হারাবে। মানুষের পুনরুত্থান সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেলে পরিস্কারভাবে উল্লেখ আছে, "মৃতেরা যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়, তবে খ্রিস্টও পুনরুত্থিত হননি। কিন্তু খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে মিথ্যাই আমাদের বিশ্বাস; আমরা আজও সেই পাপের অবস্থাতেই পরে আছি।" *(১করিন্থীয় ১৫:১৬-১৭, ১২-২২; ১থেসালনীয় ৪:১৬-১৮; মথি ২৫:৩৪-৩৫)*।

ইস্টারের (পুনরুত্থান) পর্বের অর্থ: "ইস্টার" শব্দের বাংলা অর্থ করা হয়েছে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্ব, অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের করব হতে পুনরুজ্জীবিত হওয়া। পুনরুত্থান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো **'পুনরায় উদিত হওয়া, জেগে উঠা'**। আধ্যাত্মিক অর্থে **'বিশ্বাসী হওয়া, চেতনা ফিরে পাওয়া'**। অর্থাৎ **"নিম্নতম স্থান হতে উঠে আসা"**। এই যে নিম্নে গমন করা ও উপরে উঠে আসা, এর মধ্যেই রয়েছে মহিমা ও গৌরব। আর তা হচ্ছে বিজয়ের। পুনরুত্থানের দ্বারাই যিশুর গৌরবময় ও মহিমাময় রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

"যিশুর পুনরুত্থান হলো মৃত্যু থেকে জেগে ওঠা। তাঁর পূর্ণ এবং চরম আত্মপ্রকাশ। তাঁর পুনরুত্থান দেখে তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে পূর্ণভাবে জানতে পারেন এবং তাঁর জীবনের অর্থ তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে, তারা যিশুর প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠেন ও তাঁর পুরুত্থানের সুসংবাদ মানুষের কাছে নির্ভয়ে প্রচার করতে আরম্ভ করেন।" যিশুর পুনরুত্থানের অর্থ তাদের কাছে হলো, "তিনি নতুন জীবনে উত্থিত হয়েছেন। আর সে জীবন, ঈশ্বরের আপন গৌরবময় ও চিরস্থায়ী জীবন। পুরুত্থানের ফলে এখন যিশু চিরজীবিত ও ঈশ্বরের আপন মহিমা সহভাগিতা করছেন।"

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও বিশ্বের খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ মহাসমারোহে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান মহা পর্ব উদ্‌যাপন করেছে। পুনরুত্থান উৎসবের মূল বাণী হলো **শান্তি ও আনন্দ**। পুনরুত্থান পর্বোৎসব বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির আনন্দ-উৎসব। সকল জাতির উৎসব। এই উৎসব হলো: মিলনের, একতার, আনন্দের, ক্ষমার, ভালোবাসার ও শান্তির উৎসব ।

যিশু খ্রিস্ট আমাদের আদর্শ। তিনি আমাদের মুক্তিদাতা। তাঁর মৃত্যু ও পুরুত্থানের কারণে, তিনি পৃথিবীর মানুষের কাছে হয়ে উঠেছেন ক্ষমা, ভালোবাসা, শান্তি, ন্যায্যতা, আনন্দ, বিশ্বাস ও মুক্তির আদর্শ। সমস্ত অকল্যাণ, মন্দতা, পাপময়তা, রোগ-ব্যাধি, এমনকি মৃত্যুকে তিনি জয় করেছেন। তিনি মৃত্যু বিজয়ী। জাগতিক কোন শক্তি, এমনকি কবরও তাঁকে হারাতে পারেনি। প্রভু যিশু খ্রিস্ট পুনরুত্থান করেছেন। তিনি মহাবিজয়ী। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে পুনরুত্থান প্রয়োজন। অন্ধকার হতে আলোতে, অসত্য হতে সত্যে, অন্যায় হতে ন্যায়ে, মৃত্যু হতে নতুন জীবন লাভের জন্য।

২০২১ খ্রিস্টাব্দের পুনরুত্থান সকল মানুষের জীবনে প্রচুর শান্তি আশীর্বাদ বয়ে আনুক। সকলের জীবন হতে জরা-জীর্ণতা রোগ-ব্যাধি, মন্দ-চিন্তা, পাপময়তা দূর হয়ে নতুন জীবনে খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থান হোক। মানুষের জন্য বয়ে আনুক সুস্থতা ও তাঁর শান্তি আশীর্বাদ।

সহায়তাকারী গ্রন্থ:

১."মঙ্গলবার্তা, ফা: খ্রিস্তিয়াঁন মিঙো, এস.জে. প্রতিবেশী প্রকাশনী: সেপ্টম্বর: ২০১৯খ্রি:।

২.কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা: বাংলাদেশ কাথলিক বিশয সম্মিলনী: ১ম প্রকাশ: জুবিলীবর্ষ: ২০০০খ্রি:॥

পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র: ‘এক পিতার হৃদয় দিয়ে’ এর আলোকে ধারণাপত্র ও অনুধ্যান

সংকলনে: মানিক উইলভার ডি’কস্তা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সাধু যোসেফ-এর বর্ষ: ৮ ডিসেম্বর ২০২০- ৮ ডিসেম্বর ২০২১৩) এক বাধ্য পিতা

মারিয়ার কাছে যেমন করেছেন, যোসেফের কাছেও তেমনি ঈশ্বর তার পরিত্রাণ পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। চারটি স্বপ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর তার পরিকল্পনা যোসেফকে জানিয়েছেন।

মারিয়ার রহস্যময় গর্ভধারণের সংবাদ শুনে যোসেফ বিচলিত ছিলেন। “তিনি মারিয়ার দুর্নাম” না করে “গোপনে ত্যাগ করবেন” বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন *(দ্র: মথি ১: ১৯)*।

প্রথম স্বপ্নে স্বর্গদূত যোসেফকে মারিয়ার গর্ভধারণের প্রকৃত রহস্য প্রকাশ করে তার গুরুতর দ্বিধা দূর করেন *(দ্র: মথি ১: ২০-২১)*। যোসেফের সাড়াদান ছিল অভূতপূর্ব, “ঘুম ভেঙ্গে গেলে প্রভুর দূত তাঁকে যা করতে বলেছিলেন; তিনি তা-ই করলেন” *(মথি ১:২৪)*। ঈশ্বরের প্রতি শর্তহীন বাধ্যতার ফলেই যোসেফ কঠিন সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে মারিয়াকে মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছেন। দ্বিতীয় স্বপ্নে স্বর্গদূত যোসেফকে ঘুম থেকে জেগে উঠে মারিয়া ও শিশু যিশুকে নিয়ে মিসরে পালাতে বলেন, অনির্দ্দিষ্টকাল সেখানে থেকে যেতে বলেন, কারণ হেরোদ শিশুটিকে ধ্বংস করার জন্য খুঁজতে শুরু করবে *(দ্র: মথি ২: ১৩)*। কঠিন চ্যালেঞ্জ যোসেফের সামনে– নিজ দেশ, পরিচিত সমাজ থেকে দূরে চলে যাওয়া, অন্য দেশে শরনার্থী হওয়া, অনিশ্চিত রুটি ও রুজি! কি করবেন তিনি? চ্যালেঞ্জ ও অনিশ্চয়তার মুখেও “যোসেফ তখন উঠলেন আর সেই রাতেই শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে রওনা হলেন। হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই রয়ে গেলেন” *(মথি ২: ১৪-১৫)*। নিরাপদে নিজ দেশে ফিরে আসার স্বপ্নে মিসরে শরনার্থী যোসেফ অপেক্ষার প্রহর গুনছিলেন। তৃতীয় স্বপ্নে স্বর্গদূত তাকে জানান শিশু যিশুকে যারা মারতে চাইছিল তাদের মৃত্যু হয়েছে, তাই সে যেন ইস্রায়েলে ফিরে যায় *(দ্র: মথি ২: ১৯-২০)*। বাধ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখালেন তিনি, “উঠে শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে চলে গেলেন” *(মথি ২: ২১)*। সব ফিরে পাবার আশা ও আনন্দে যোসেফ যখন নিজ পিতৃভূমির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন তখনই চতুর্থ স্বপ্ন! আবার স্বর্গদূত! যোসেফ স্বর্গদূতের আদেশে যুদেয়ায় না ফিরে, চলে গেলেন গালিলেয়া প্রদেশে, বাস করতে লাগলেন নাজারেথ নামে অখ্যাত একটি শহরে *(দ্র: মথি ২: ২২-২৩)*।

মঙ্গলসমাচার লেখক লুক লিখেছেন যোসেফ নাজারেথ থেকে বেথলেহেম পর্যন্ত দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রা করেছেন মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে, যেন নিজের পূর্বপুরুষদের শহরে যিশুর নাম লেখাতে পারেন। তখন রোম-সম্রাট অগাস্টাসের হুকুমে লোকগণনা করা হচ্ছিলো। *(দ্র: লুক ২: ১-৬)* সেখানেই শিশু যিশুর জন্ম হয় *(দ্র: লুক ২: ৭)* এবং সাম্রাজ্যের অন্য শিশুদের মত যিশুর নামও অন্তর্ভূক্ত হয়। লুক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে মোশীর সমস্ত বিধান যিশুর পিতা-মাতা পালন করেছেন– তার পরিচ্ছেদন করেছেন, মারিয়ার শুদ্ধিক্রিয়া করেছেন এবং প্রথমজাত সন্তান হিসেবে যিশুকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছেন *(দ্র: লুক ২: ২১-২৪)*।

যোসেফ যাত্রাপুস্তকের শিক্ষানুযায়ী *(দ্র: ২০: ১২)* যিশুকে নিজের পিতা-মাতা’র প্রতি বাধ্য হতে শিখিয়েছেন *(দ্র: লুক ২: ৫১)*। নাজারেথের নীরব জীবনগুলোতে যোসেফের কাছে যিশু পিতার ইচ্ছা মেনে চলতে শিখেছেন। যোসেফের শিক্ষায় পিতার ইচ্ছা মেনে চলা যিশুর দৈনিক খাদ্যের মতই স্বাভাবিক ও দৈনন্দিন বিষয় হয়ে উঠেছিল *(দ্র: যোহন ৪: ৩৪)*। এমনকি জীবনের কঠিনতম সময়ে গেৎসিমানী বাগানে মানবিক দূর্বলতায় ভেঙ্গে পড়লেও যিশু পিতার ইচ্ছা মেনে নেয়ার পথই বেছে নিয়েছেন, “চরম আনুগত্য দেখিয়ে তিনি মৃত্যু, এমন কি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন” *(ফিলি ২: ৮)*। “নিজের দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই তিনি অনুগত হতে শিখেছিলেন” *(হিব্রু ৫: ৮)*।

যোসেফ ছিলেন ঈশ্বর কর্তৃক আহুত একজন মানুষ, যিনি ব্যক্তি যিশু ও তার প্রেরণকাজে সেবা দান করেছেন পিতৃত্বের অনুগ্রহে। যোসেফ তাই পরিত্রাণ রহস্যের পূর্ণতা সূচনায় ঈশ্বরের সহকর্মী, পরিত্রাণ কাজের একজন বিনম্র সেবাকর্মী।

৪) এক পিতা, যিনি গ্রহণ করেন

বিনা শর্তে যোসেফ মারিয়াকে গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বর্গদূতের কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করেছেন কোন সন্দেহ না করে। আধুনিক ও বর্তমান পৃথিবীতে নারীর প্রতি মানসিক, মৌখিক এবং শারীরিক সহিংসতা যখন প্রকট, সেখানে দুই হাজার বছর আগের প্রাচীন যোসেফ নারীর প্রতি মর্যাদাশীল ও সহানুভূতি সম্পন্ন পুরুষ। যদিও রহস্যের সবটা যোসেফ জানেননি বা বোঝেননি, তবুও তিনি মারিয়ার সম্মান, মর্যাদা এবং জীবন রক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিজের সিদ্ধান্তে যোসেফের দ্বিধা ছিল, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুগ্রহ পরমেশ্বর যোসেফকে দিয়েছেন।

বর্তমান সময়ে আমাদের জীবনে অনাকাঙ্খিত এমন অনেক কিছু ঘটে যা আমাদের দৃষ্টিতে মর্যাদাপূর্ণ ও আশানুরূপ নয়; খারাপ সময় ও অবস্থার জন্য আমরা হতাশ হই, ঈশ্বরকে দোষারোপ করি। কিন্তু যোসেফ নিজের ধারণা বা মনোভাব নিয়ে কষ্টভোগ না করে সেগুলোকে পাশে ঠেলে রেখেছেন; বরং যা ঘটছে তা এবং ঐশ রহস্যগুলো গ্রহণ করেছেন, সেগুলোকে নিয়েই দিন কাটিয়েছেন, মন্দ-ভালো চলমান জীবনের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সেগুলোকে নিজের জীবন ইতিহাসের অংশ করে নিয়েছেন। আমাদের জীবনে মন্দ সময় আসে, প্রচণ্ড খারাপ অবস্থা তৈরী হয়, এগুলো আমাদের জীবনেরই ক্ষতপূর্ণ ইতিহাস। ইতিহাসের ক্ষতের সাথে পুনর্মিলন না হলে আমরা সামনে এগোতে পারিনা, কারণ সেক্ষেত্রে আমরা মানবিক আকাঙ্খা আর না পাওয়ার বেদনার কাছে জিম্মি হয়ে থাকি।

যোসেফ আমাদের কাছে যে আধ্যাত্মিক পথ উপস্থাপন করেছেন তা ব্যাখ্যা চায়না, বরং গ্রহণ করে। এই ধরণের গ্রহণীয় মনোভাবের ফলেই পাওয়া যায় বৃহত্তর ইতিহাসের কিছুটা দেখতে পাওয়া ও গভীরভাবে এর অর্থ বুঝতে পারার মূল্যবান অনুগ্রহ। এই গ্রহণীয় মনোভাবের সাক্ষ্য আমরা দেখেছি যোবের মধ্যে, যিনি তার স্ত্রীকে বলেছেন, “আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কি কেবল মঙ্গলই গ্রহণ করবো, অমঙ্গল গ্রহণ করবো না?” *(যোব ২: ১০)*

যোসেফ হাল ছেড়ে দেয়া মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়ভাবে সক্রিয় ব্যক্তি। আমাদের জীবনে সব অবস্থাকে স্বাগত জানানো ও গ্রহণ করার সক্ষমতা হচ্ছে পবিত্র আত্মার ক্রিয়াশীল দানের প্রকাশ। আমাদের জীবন যেমন, তাকে তেমনভাবে গ্রহণ করার শক্তি একমাত্র ঈশ্বরই অনুগ্রহ করে আমাদের দিতে পারেন, তা সে জীবনে যতই দ্বন্দ্ব ও হতাশা থাকুক না কেন।

ঈশ্বর যোসেফকে যেভাবে বলেছেন, “দায়ূদ-সন্তান যোসেফ,... ভয় ক’রো না” *(দ্র: মথি ১: ২০)*, সেভাবে আমাদেরও বলছেন, “ভয় ক’রো না”। আমাদের শুধু যা করতে হবে তা হলো, সকল ক্রোধ ও ক্ষোভ, হতাশা পাশে ঠেলে দেয়া এবং যা যেভাবে আছে সেভাবেই তা গ্রহণ করা, এমনকি সেগুলো আমাদের আশানুরূপ না হলেও। তবে এই মনোভাব যেন হাল ছেড়ে দেয়া মনোভাব না হয়, বরং মনোভাবে যেন থাকে আশা ও সাহস। সময় ও অবস্থা যত খারাপই হোক না কেন, ঈশ্বর পাথরেও ফুল ফোটাতে পারেন। সাধু পল বলেন, “যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে,... তাদের মঙ্গলের জন্য সব কিছুই একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে” *(দ্র: রোমীয় ৮: ২৮)*।

অন্যেরা যেমন, তাদের সেভাবেই গ্রহণ করতে, স্বাগত জানাতে যোসেফ আমাদের অনুপ্রাণিত করেন; অনুপ্রাণিত করেন বিশেষভাবে দূর্বলদের গ্রহণ করতে, কারণ যারা দূর্বল ঈশ্বর তাদেরই মনোনীত করেন *(দ্র: ১ করি ১: ২৭)*। সাধু যোসেফ পিতৃহীনদের পিতা এবং বিধবাগণের রক্ষক। (চলবে)

সর্বজনীন উৎসব : প্রেক্ষাপট, বাংলা নববর্ষ

ডাঃ নেভেল ডি'রোজারিও

আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ। এর বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে দেশজ ঐতিহ্যভিত্তিক উৎসব পার্বণ এবং অনুষ্ঠান ঘিরে। অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা ভাবনা বাংলা নববর্ষের মূলচেতনা। পহেলা বৈশাখ এখন বাঙালী সংস্কৃতির এক বিরাট ও ব্যাপক অংশ বলেই পহেলা বৈশাখের অধিকার আজ শুধু বাঙালীর নয় এ ভূমিজ সব মানুষের। সর্বজনীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতাই এ পহেলা বৈশাখকে গড়ে তুলেছে বাংলার ও বাঙালীর সংস্কৃতির আচরিত সব সারাৎসার নিয়ে ।

একটু পেছনের দিকে তাকালে দেখা যায়, ৫৯৮ হিজরি মোতাবেক ১২০১ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়। বহিরাগত মুসলিম শাসনেরকালে চান্দ্র মাস হিসেবের হিজরি সন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে জাতীয় সনে পরিণত হয় যা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশী যুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সন প্রবর্তনের এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হলে হিজরি সনের প্রচলনও এখানে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়। সূর্যের আবর্তনে দিবা-রাত্রি এ হিসেবে সৌরসন বা সৌরবর্ষ নামে তা প্রচলিত বাংলার মাটিতে সে সময় ফসলি সনেরও চল ছিল। সামসুজ্জামান খানের "বাংলা সনের উৎপত্তি" বই থেকে জানা যায়, হিজরি সন চন্দ্র সন হিসেবে এ অঞ্চলে চালু হওয়ার পর সৌর/ফসলি বনাম হিজরি সন গণনায় প্রশাসনের কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। চন্দ্র সন সৌর সন অপেক্ষা ১১দিন কম হওয়াতে ঋতুর সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারেনি বরং সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ফলে রাজস্ব আদায়ে কয়েক বছর পর পর দারুণ জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হতো। কেননা দুটোতে ছিল গণনার ফারাক।

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে (৯৬৩ হিজরি) মোঘল বাদশাহ হুমায়ুনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মহামতি বাদশাহ আকবর দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত হন। রাষ্ট্র সাধনার প্রয়াসে আকবরকে বহুবিধ সমন্বয় সাধনের জন্য উদ্যোগী হতে হয়েছিল। তিনি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে একটি নতুন সৌর সন উদ্ভাবনের জন্য তদানীন্তন কালের একজন বিশেষজ্ঞ জ্যোতিবিজ্ঞানী আমীর ফতেহউল্লাহ সিরাজীকে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে (৯৯২ হিঃ) দায়িত্ব দেন। আকবরের রাজ দরবারের রাজজ্যোতিষি মহাপন্ডিত ব্যক্তিত্ব আমীর ফতেহউল্লাহ সিরাজী বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রচলিত হিজরি সালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ও হিজরি সনের বর্ষকে বজায় রেখে বর্ষ গণণা ৩৫৪ দিনের স্থলে ৩৬৫ দিনে এনে নতুন বাংলা সালের উদ্ভাবন ও গণনার প্রস্তাব করেন। চান্দ্র ও সৌর সাল সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির হলেও সৌর ও চান্দ্র সাল সম্মিলিত হয়ে এক অভিনব সালের জন্ম দিয়েছে যা বাংলা সালের বৈশিষ্ট্য। সরকারের তোষাখানায় খাজনা আদায়ের বিশৃংখলা এড়াতে মোগল সম্রাট আকবর তাতে অনুমোদন দেন এবং ফরমান জারি করেন যে, চান্দ্র মতে বছর গণনা না করে সৌর মতে বৎসর গণনা করা হবে। ফলে ১.২.৩ এভাবে হিসাব না করে মূল হিজরি সনের চলতি বছর থেকেই বাংলা সনের গণনা শুরু হয় এবং বাংলা বর্ষপুঞ্জির প্রবর্তনের প্রথমদিকে এটি তারিখ-ই-ইলাহী নামে পরিচিত ছিল। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ১০ বা ১১ মার্চ এটি বঙ্গাব্দ নাম নেয়। আকবরের রাজত্বের ২৯তম বর্ষে এটি প্রবর্তিত হলেও গণনা শুরু করা হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর থেকে। এদিনই আকবর পানি পথের ২য় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। এ উপমহাদেশে বা বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে আকবরের অবস্থান ছিল একটু ভিন্নধর্মী। প্রশাসনকে একটি সর্বভারতীয় ভাবমূর্তিতে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তার অবদান বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এমন উদ্যোগের বড় দৃষ্টান্তটি দীন-ই-ইলাহী। রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক স্বার্থে সমন্বয় সাধনের বহুবিধ উদ্যোগের অন্যতম ছিল বাংলা সনের প্রচলন। সিরাজী উদ্ভাবিত বাংলা সনে নানাবিধ ভাবনার সমন্বয় লক্ষ্যণীয়। সমন্বয়ের প্রথম দিকটি ইসলামী হিজরি সনের সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের একটি সহতর পদ্ধতির মিশ্রণ। দ্বিতীয় দিকটি ছিল হিমুকে পরাজিত করা বিজয়গর্বী আকবরের নিষ্কন্টক সিংহাসনে আরোহণ করা দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশে বাংলা সনের গণনা শুরু করা বিবিধ ও নানামাত্রিক সমন্বয়ের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। আকবরের রাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত ভাবনার ফসল ছিল বাংলা সন। জন্ম বছরেই বাংলা সন সে সময়ের হিজরি সন মোতাবেক ৯৬৩ বছর বয়স নিয়ে যাত্রা শুরু করে। তাই জন্মকাল থেকেই বাংলা সাল খ্রিস্টীয় সাল থেকে ৫৯৩ বছরের অনুজ। সে হিসেবে খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৯৩ বছর বাদ দিলেই বাংলা সালের হিসাব মেলে। বাংলা সন মূলত হিজরি সনেরই সৌর গণনার ফসল ও ইসলামী উত্তরাধিকার থেকেই প্রাপ্ত হিজরি সনের সৌররূপ। সন্দেহ নেই এমন উদ্যোগের পেছনে ধর্মীয় প্রণোদনের চেয়ে বড় ছিল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের দিকটি। ধর্ম বিভাজিত রাষ্ট্রের চেয়ে ধর্ম সমন্বিত রাষ্ট্র যে প্রশাসনিক আশীর্বাদ, তা আকবরের ভালই জানা ছিল। জ্যোতিষ বিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহর কবর ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায়। তাঁর নামেই এলাকাটির নামকরণ হয়েছে ফতুল্লা।

ইতোপূর্বে মাসের প্রতিটি দিনের একটি করে স্বতন্ত্র নাম ছিল, যা মনে রাখা ছিল কষ্টসাধ্য। তা বিবেচনা করে সম্রাট শাহজাহান তার ফসলি সনে সেগুলোকে সামাজিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেন। সম্ভবত একজন পর্তুগীজ পন্ডিতের সহায়তায় তিনি সাত দিনের সমন্বয়ে বর্তমানের সপ্তাহ পদ্ধতি চালু করেন। ইউরোপে ব্যবহৃত রোমান নামকরণ পদ্ধতির সঙ্গে সপ্তাহের দিনগুলোর লক্ষ্যণীয় মিল রয়েছে। যেমন Sun এর সঙ্গে রবির Moon এর সঙ্গে সোমের, Mars এর সঙ্গে মঙ্গলের প্রভৃতি। সে সময় বাংলা সপ্তাহ শুরু হতো রোববারে। শক রাজবংশের স্মরণার্থে ৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত শকাব্দ থেকে এসেছে মাসের নামগুলো, যা এসেছে তারকামণ্ডলীর নামানুসারে। যেমন বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ প্রভৃতি। হিজরি থেকে সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলা বর্ষপুঞ্জির জন্ম হলেও এর মাস দিনগুলো এ দেশে প্রচলিত গ্রহ-নক্ষত্রের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে বোঝা যায় বিদেশী প্রভাব বাংলা সনের উপর পড়েনি। বাংলা বর্ষ প্রবর্তনের পূর্বে সমকালীন বাংলাদেশে বাংলা মাসের কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কয়েকটি ঐতিহাসিক দলিলে। তখন বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ছিল বেশ কয়েকটি বর্ষপুঞ্জি। ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায়ের (১৯০৩-৮১) মতে, আগে নববর্ষের প্রথম মাস ধরা হতো অগ্রহায়ন মাস থেকে। মুর্শীদ কুলি খাঁর (?-১৭২৭) আমল থেকে (১৭১৩-২৭) খাজনা আদায়ের স্বার্থে অখন্ড বাংলায় বছরের প্রথম মাস অগ্রহায়নের পরিবর্তে নির্ধারিত হয় বৈশাখ। বাস্তবতার প্রয়োজনেই বহিরাগত শক্তি দেশজ কাঠামোর সাথে রফা করে নেয়। লিপইয়ার বা অধিবর্ষের সমস্যা দুর করার জন্য ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর তত্ত্বাবধানে ডঃ মুহাম্মদ শহীদউল্লাহ্‌র নেতৃত্বে গঠিত বঙ্গাব্দ সংস্কার কমিটি চার বছর পর পর চৈত্র মাস ৩০ দিনের পরিবর্তে ৩১ দিনে গণনা করার পরামর্শ প্রদান করে। সব মিলিয়ে বঙ্গাব্দ বিশ্বের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত সনগুলোর সমমর্যাদা সম্পন্ন হয়ে উঠেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এটিই হল বাংলা সন প্রচলের আদি বৃত্তান্ত ও তার ধারাবাহিকতা।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা বর্ষ হিন্দু কিংবা মুসলমানের একক কোন পঞ্জিকা-সম্পদ নয়, বাংলা ভাষাভাষী সকলেরই ঐতিহ্য। অথচ এ কথা অপ্রিয় হলেও সত্য, হিজরি বর্ষপঞ্জি

অনুসরণে বাংলা সনের উৎপত্তি হয়েছে বলে উনিশ শতক হতে এখনও অনেক অমুসলিম লেখক-প্রকাশক বঙ্গাব্দের মধ্যে যবন গন্ধ শুঁকে পান। তারা যেমন তাদের গ্রন্থের প্রকাশকাল শকাব্দ, রংবৎ প্রভৃতির ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তেমনি বেশ কিছু মুসলিম লেখক-প্রকাশক বাংলা সনের মাঝে গ্রহ-নক্ষত্রের নামকে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি মনে করে বঙ্গাব্দকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গ্রন্থের প্রকাশকাল কেবল খ্রিস্টাব্দ ব্যবহার করেন। কারো কারো আবার পছন্দ খ্রিস্টাব্দের পরিবর্তে ইসায়ী লেখার। অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, প্রায় চার'শ বছরের ঐতিহ্য থাকা স্বত্বেও এদেশীয় বাঙ্গালী খ্রিস্টান সম্প্রদায় ষাটের দশক পর্যন্ত 'নিজভূমে পরবাসী' সেজে নিজেদেরকে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করার মোহজালে বিভোর ছিল। সে সময়কার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং কিছু বিদেশী যাজকবৃন্দের ইংরেজী নববর্ষকে বড়দিন পরবর্তী ছোট ক্রীসমাস হিসেবে চিহ্নিত ও প্রচারই সম্ভবত এর প্রধানতম কারণ। ষাটের দশকের শেষার্ধে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থানের এ অংশের প্রবল জাতীয়তাবাদে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢাকার খ্রিস্টান যুব প্রতিষ্ঠান সুহৃদ সংঘ যেমন একুশে ফেব্রুয়ারিতে এ দেশীয় খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে প্রথমবারের মত শহীদ মিনার-মুখী করে তুলেছিল তেমনি আগ্রহী করে তোলে সম্প্রদায়ের সবাইকে বাংলা নববর্ষের উৎসবে সামিল হতে।

পূর্ববঙ্গ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর পাকিস্তান শাসকের বিপক্ষে একটা সঙ্গত আন্দোলনের ধারা বইতে শুরু করে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ছায়ানটের উদ্যোগে রাজধানী ঢাকায় প্রথমে ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুলের কষ্ণচুড়া গাছের নীচে এবং পরে রমনা বটমূলে প্রতিবছর পহেলা বৈশাখের সকালে নববর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজন হতে থাকে। নববর্ষ পালনের মধ্যে পাক শাসকবর্গ তৎপর হয়েছিলেন পাকিস্তান বিরোধী সূত্র আবিস্কার করতে, যার ফলে গোড়াতেই ঢাকার বাইরের অধিকাংশ শহর এলাকায় বাংলা নববর্ষ উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা বন্ধ হয়ে যায়। তার মাঝেও পাকিস্তানী শাসকদের রক্ত চক্ষু তোয়াক্কা না করে এবং অনেক বাধাবিঘ্ন ডিঙিয়ে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হতে থাকে রমনা বটমূলসহ আরও কোনো কোনো এলাকায়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু সরকার এ দিনটিকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করে ।

বিশ্বে নববর্ষ পালনের প্রথম খবর পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ায় খ্রিস্টাব্দ পূর্ব ২০০০ অব্দে, তখন ইংরেজি মাস কখনও মার্চ, সেপ্টেম্বর বা ডিসেম্বরে হত এবং নববর্ষও সেভাবেই গণনা করা হত। ইংরেজি নববর্ষের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, ৪৬ খ্রিস্ট পুর্ব অব্দে জুলিয়াস সিজার যখন বাৎসরিক ক্যালেন্ডার পরিবর্তন করেন এবং বর্তমানে প্রচলিত জানুয়ারি মাসকেই বছরের প্রথম মাস হিসেবে ধার্য করেন তখন থেকেই বিপুল জাকঁজমক ও আনন্দ-উল্লাসের সাথে ইংরেজি নববর্ষ পালিত হয়ে আসছে। শীতপ্রধান দেশে সাধারণত নববর্ষ আসে জানুয়ারি মাসে; কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান আমাদের দেশসহ উভয় বাংলায় বাংলা নতুন বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। দু'দেশেই তখন প্রাকৃতিক বৈপরীত্যের সাক্ষাত পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে এ সময় বরফপাত, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নববর্ষ আসে। বাংলায় তখন হর-হামেসা আসে কাল বৈশাখীর কাল ছোবল। সাধরণ মানুষ ভয়-ভীতির সঙ্গে চিন্তা করে সারা বছরটি কেমন যাবে, দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার কারণেই সে চায় আনন্দ করতে, বেছে নেয় নতুন দিনের আগমনী উৎসবের আমেজ। মোঘলেরা ইরানের নওরোজ বা নববর্ষ অনুষ্ঠানকে ঈদ বা আনন্দ উৎসবরূপে পালন করতো। এটি ইরান থেকে এদেশে পালনের রেওয়াজ প্রথম আমদানি করেন সম্রাট হুমায়ুন।

বিভিন্ন দিনক্ষণের সঙ্গে যুক্ত আছে আমাদের পূণ্যাহ বা পুণ্যাহ দিনগুলো ; এ পুণ্য দিনগুলো হলো অনুষ্ঠানের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রানুমোদিত শুভ দিন। পুন্যাহ সাধারণত সম্রাট, সুলতান, নওয়াব, জমিদার বা মহাজনদের বাড়িতে হত। এতে প্রজাগণ জমিদার মহাজনগণকে তাদের খাজনা বা পাওনা আংশিক বা তামাম শোধ হিসাবে দিতে পারতো। এ উপলক্ষে জমিদারদের মিষ্টিমুখ করাবার রীতি এবং জমিদার-মহাজনদের সঙ্গেও সাধারণ প্রজা বা খাতকের দেখা (দর্শন) হতে পারতো তারা সবাই সেদিন দর্শনদাতা হুজুরের কাছে অবশ্যই হাজির থাকতো। ফসলি সনের প্রথম দিন, প্রজাপীড়ন করে কৌশলে রাজস্ব আদায়ের জন্য সৃষ্ট হলেও তাকে উৎসবের রূপ দিয়েছে তার কর্মচারীরা, রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। পাশাপাশি ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ই বেশি যুক্ত হতেন পয়লা বৈশাখ থেকে গণনা করা বছরের হিসাব-নিকাশ নিয়ে। একটি প্রশস্ত শতরঞ্জির উপর পুণ্যাহের মতই বসানো থাকতো 'সর্বমঙ্গলের' প্রতীক একটি আমের ডাল-পানিভর্তি পিতলের কলসী খাতকগণ এখানেও প্রাপ্ত সম্পূর্ণ (তামাম শোধ) বা আংশিকও দিতে পারতেন যা নববর্ষের হালখাতায় (নতুন খাতায়) তোলা হত। এ উপলক্ষে পূর্বে গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই একটি লাল রঙের পত্র মুসলমান মহাজন হলে লিখা থাকতো এলাহী ভরসা এবং হিন্দু মহাজন বা দোকানী হলে 'ও' গণেশায় নমঃ লিখা হতো। গণেশ হ'ল ব্যবসায়ের দেবতা। 'হাল' শব্দটি ফারসী অর্থাৎ বর্তমান অবস্থানকাল।

বাংলা সনের পয়লা দিনই অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ কালক্রমে হয়ে উঠলো বাঙালীর সমন্বিত ও সর্বজনীন সাংস্কৃতিক মানচিত্রের একটি শক্তিশালী প্রতীক। পহেলা বৈশাখ এখন আমাদের জাতীয় উৎসব অনেকে ধন্য শুধু একদিনের জন্য বাঙ্গালী হয়েও। কেননা এ একদিনের জন্য বাঙালি হয়েও অনেকে জাতিগত আত্ম-পরিচয় লাভ করার সুযোগ পেতে পারে, মন পরিচ্ছন্ন-পবিত্র করে বাঙ্গালীর জাতীয় পোশাক পরতে পারে, বাঙ্গালী খাদ্য আস্বাদন করে, বাংলায় গান গেয়ে ও বাংলা গান শুনে, কেউবা ঘরের বাইরের বা রমনার বটমূলের সমাবেশে যায়, কোলাকুলি করে, জাতীয় উৎসবে মিলিত হয়। তাই বলতে হয় শুধু এ একদিনের বাঙ্গালী তার সম্পুর্ণ সাজে, চরিত্রে ও মানসিকতায় পরিচিতি লাভ করে। সে জন্য বলা যায় বাঙালীর একটি মাত্র উৎসব রয়েছে পহেলা বৈশাখ। এ ছাড়া এদিক-সেদিক তাকিয়ে যত কথাই বলি না কেন, বাঙ্গালীর জীবনে আর কোন সার্বজনীন উৎসব নেই। তাইতো নববর্ষ পরিণত হয়েছে বাঙ্গালীর উৎসবে, রবীন্দ্রনাথের উৎসবে, মানুষে-মানুষে মিলনের উৎসবে। বাঙ্গালীর চেতনা অনুভব করতে পেরেছিলেন আধুনিক বাঙ্গালীর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। 'প্রতিদিনকার মানুষ ক্ষুদ্র-দীন, একাকী কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ। সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) । এ চেতনায় গতিবেগ প্রদান করেন নজরুল, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং এদেশের একুশের ভাষা আন্দোলনের অবদান, এদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ ইতোমধ্যে প্রধান জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা যে সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে এক মুক্তধারার সৃষ্টি করে বাংলাদেশে উৎসবের নানা মাত্রিক বিস্তার তার চমৎকার নজীর। সাম্প্রতিককালে ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউট ছাত্রদের আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী মিছিলের সংযোজন এবং নানা মুখোশের ব্যবহার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আবিলতা ও ভন্ডামীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক যোগাযোগের সূত্র হিসেবে নববর্ষ উৎসবের প্রবর্তন করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নতুন রূপে এ উৎসবের পূর্ণতা দান করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, কোন দলীয় বা ধর্মের আনন্দ নয়, মানুষে-মানুষে মিলন ঘটাতে হবে। আর সবার মিলনের জন্যে চাই বড় প্রাঙ্গন। অবশ্য কারও কারও ধারণা, রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু আগে ব্রাহ্ম সমাজ সামাজিক যোগসূত্রস্বরূপ নববর্ষ পালন করেছিলেন, সেটা শকাব্দ হিসাবে এবং দেবেন্দ্রনাথ যেহেতু পারস্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন, ছিলেন কবি হাফিজের ভক্ত, তাই সে দৃশ্যের প্রারম্ভে তাঁর চিত্তে সে পটভূমি সৃষ্টি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এর থেকে ছেকে ধর্মীয় রূপটা বের করে কেবল সাংস্কৃতিক বাতাবরণ বজায় রাখেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে

সকলে যেন এ উৎসবে অংশ নিতে পারে সে দিকে খেয়াল রাখলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, পহেলা বৈশাখ বাঙালীর প্রকৃত উৎসব। সকল শ্রেণীর সকল ধর্মের লোককে এ উৎসবে আহবান করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কোন ধর্ম বা দলীয় চেতনায় প্রকৃত মানবমিলন সম্ভব হতে পারে না; সকলের মিলনের জন্য একটা খোলা প্রাঙ্গণ চাই। ভেদাভেদ ভুলে স্বাভাবিক রূপে হৃদয়ে মিলতে হবে। শান্তিনিকেতনে প্রথম নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৩০৯ বঙ্গাব্দে। নববর্ষ শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণটি তিনি দেন এদিন ভোরবেলায়। বিকেলে সমবেত অতিথিদের সামনে স্বয়ং গান গেয়ে শোনান ঃ 'আমারে করো তোমার বীণা'। সভ্যতার সংকটের মত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ এবং জন্মদিনের কাব্যের প্রকাশ ঘটে নববর্ষের দিনে। নববর্ষের সেই সার্বজনীন কল্যাণমুখী সৌন্দর্য ও মিলনের ধারা একরকম সৃজন করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। চির নতুনের মধ্যে মানুষের জীবন বিকাশের চির প্রার্থনা শোনা যায় তাঁরই গানে, কথা ও কবিতায় ঃ 'হে চির নতুন আজি এ দিনের প্রথম গানে/জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে'। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত বর্ষার কবি ও গীতিকার, সুরকারও। কিন্তু নববর্ষেও কোন অংশেই তিনি কম নন। পচিশে বৈশাখের উদাহরণ বাহুল্যমাত্র। শুধু বলিঃ বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে/স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে/নদীনদে গিরি গুহা পরিবারে/নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা/নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।

আমাদের নববর্ষের সব থেকে বড় আনন্দ অধুনালুপ্ত বৈশাখী মেলা। যে কোন গ্রাম প্রান্তের নদী তীরে বটের ছায়ায় বা বাজারে জমে উঠতো সে মেলা, যাতে গ্রামীণ শিল্পীদের মাটি, কাঠ, লোহার তৈরী নানা শিল্প , চাষাবাদের লাঙল, দা কুড়াল, খুন্তি, কাঁচি সব পাওয়া যেত। তখনকার স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক সি.এ বেন্টলী (C.A Bently) তার Fair and Festivals in Bengal বইতে ১৯২১ সনে সমগ্র বাংলায় সাড়ে সাত হাজার মেলার বিবরণ দিয়েছেন, যেখানে ৫০০ থেকে ৫ লাখ লোকের পর্যন্ত সমাবেশ হতো। লিখেছেন- "এসব মেলায় যেসব দ্রব্যসামগ্রী আসতো, তা দিয়ে ছোটখাটো এক একটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামই হতে পারতো"। পহেলা বৈশাখ ছিল সবার জন্য। একই সঙ্গে কোন নদী তীরে, হাটে বাজারে বসতো বৈশাখী মেলা। বৈশাখী মেলা আয়তনে যত বড় হোত তার চেয়ে বেশী বড় হোত তার অসাম্প্রদায়িক চেহারা----- বড় ছিল তার ধর্মনিরপেক্ষতা।

ঢাকা শহরের রমনার বটমূলে পহেলা বৈশাখ খুব ভোরে বাঙালীরা মিলিত হয়ে প্রীতি বিনিময়, গান, কোলাকুলি করে এ উৎসবের সূচনা করেন। এর দেখাদেখি দেশের অন্যান্য স্থানেও তা ছড়িয়ে পড়ে, তবে মুলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্ত অথবা চিত্তে যাঁদের রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ প্রথম পহেলা বৈশাখ পালন করেন ১৩০৯ বঙ্গাব্দে, এই রমনা বটমূলের মতোই একটা অঙ্গনে, ছায়াচ্ছন্ন ভাবগম্ভীর পরিবেশে শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলে। এপার বাংলায় উৎসব শুরু হয় রমনার বটমূলে কিংবা নিজ নিজ স্থানে জীবনের কোন ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে---ভদ্র সুশ্রী সুধী পরিবেশে চমৎকার মার্জিত আলাপ আচরণ সজ্জন সুন্দরী মহিলাবৃত এবং কিশোর-কিশোরী নন্দন কাননের এ সুন্দর সমাবেশে, তাঁদের সুশ্রুত কণ্ঠধ্বনির মাঝে পহেলা বৈশাখের সকাল বেলা। সুর্য তখনও ওঠেনি, কেবল লাল আগামবার্তা পাঠিয়েছে, সকলে তখন জড়ো হয় নতুন সাজে, পোশাকে সুমিষ্ট দৃষ্টির ফুলের মৌ মৌ গন্ধে। সকলের হাসি হাসি মুখ ভালবাসার দৃষ্টি ও হাসি, হৃদয় দেয়া নেয়ার সুযোগ। প্রথমে নববর্ষের নতুন দিনকে স্বাগত জানানো হয়, প্রার্থনার মতো উচ্চারণ করেন আচার্যজন যাঁরা মঞ্চে উপবিষ্ট, হৃদয়ের গভীরতা ভেদ করে সে মন্ত্র-ধ্বনি চলে যায় উপস্থিত সবার চিন্তা-চেতনায়। সবাই যেন সুর করে তাই হৃদয় থেকে আবৃত্তি করতে থাকেন। গমগম সে পবিত্র ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত, বৃক্ষপত্রপল্লব কেঁপে কেঁপে মোহিত, আদরে অনুভুতি প্রকাশও এমনিভাবে হয়। সারা চিত্তভুবন সত্যিই এক অপুর্ব মহিমায় পুলকিত হয়। তাই বর্ষে বর্ষে পহেলা বৈশাখ যেন হয় সারা বিশ্ব বাঙালীর প্রাণোৎসব, জীবনাশ্রম ঠিক যেমনি হয় সবার প্রেরণা দীক্ষা প্রতিশ্রুতির দিন। যে কোন সুস্থ সাংস্কৃতিক উদ্যোগ স্বাধীনতাকে সুসংহত করে। তাইতো অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালীর ধর্মনিরপেক্ষতার মহামিলনমেলাকে নস্যাৎ করার জন্যে সচেষ্ট হয় বাঙ্গালী জাতির শত্রু, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী বাঙ্গালীর স্বাধীনতা হরণের ষড়যন্ত্রকারী পরাজিত পাকিস্তানী শক্তির প্রেতাত্মাসম প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের এ দেশীয় দোসররা ভীত হয়ে বাঙ্গালীর মহামিলনমেলার এ উৎসবকে মানবহীন করার অপচেষ্টায় তারা এ সমাবেশে বোমাবাজির মতো ঘৃণ্য কার্যকলাপ চালায়। কিন্তু অকুতোভয় স্বাধীনচেতা বীর বাঙ্গালী চক্রান্ত কারীদের সে চেষ্টাকে প্রতিহত করে নীরব প্রতিবাদ জানায় পরবর্তী বছরগুলোতে দলে দলে যোগ দিয়ে আরও বড় ধরণের সমাবেশের মধ্য দিয়ে।

বাঙালীর জন্য অমৃত উৎসারিত নববর্ষ উদযাপনের এ শুভক্ষণকে উৎসবে পরিণত করতে অবদান যারা রেখে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্গবন্ধু, একুশ ফেব্রুয়ারি অথবা রক্ত সূর্য ঘেরা সবুজ পতাকা, তাঁরা বাঙালীর পরিচয় হৃদয় উৎস, বাঙালীর প্রাণ আদর্শ। তাঁদের অনেকে প্রয়াত, কিন্তু তাঁদের সজীব জীবন আদর্শ আমাদের পাথেয় জীবনীশক্তি॥

সত্যলোক গমন

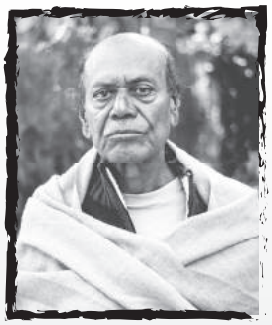

প্রয়াত সুবল পিটার কস্তা

জন্ম : ২৭ জানুয়ারি, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ।
মৃত্যু : ১ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।
গ্রাম : ফড়িয়াখালী, তুমিলিয়া মিশন
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

চিরস্থায়ী আনন্দের উৎস একমাত্র ঈশ্বর। তাকে অবলম্বন করে সংসার করলে তা হয় আনন্দের। আর তাকে বাদ দিয়ে সংসার করলে তা হয় দুঃখ ভরাক্রান্তময়। অনুরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করে ধরণীর বুকে তুমি সাজিয়ে ছিলে এক আনন্দময় সংসার, কিন্তু কোন অভিমানে ভবের এ রঙ্গলীলাকে সাঙ্গ করে তোমার বার্ধক্যের সহযাত্রীকে একাকী ফেলে, সকল সন্তান, নাতী-নাতনী ও আত্মীয় পরিজনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পুণ্য বৃহস্পতিবার রাত ১টা ৩০ মিনিটে ০১ এপ্রিল, ২০২১ পাড়ি জমালে কোন এক অজানায়.....

তবে যেখানেই যাও ভালো থেকো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

সহধর্মিনী : শান্তি ভেরোনিকা কস্তা
ছেলে ও ছেলের বউ : বিধান-দীপা
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : অনুপমা-অজয়, অর্পিতা-তাপস
নাতি-নাতনী : তূরী, তূর্য, বিদিতা, অর্জিন, অর্জয়ী

ছোট ভাই ও স্ত্রী : সুকুমার ও বাসন্তি
ছেলে ও ছেলের বউ : নিক্কন-প্রিয়া
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : নিপা-শংকর, লাভলী-সুমন
নাতি-নাতনী : দিব্য, রুদ্র, মার্বেলা, রমা, অরেন, অর্পন

বিজ্ঞ/১১২/২১

প্রাণের উৎসব : পহেলা বৈশাখ

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

বাংলার ঐতিহ্যে নববর্ষ নতুন প্রাণের সাড়া জাগায় বাঙালীর ঘরে। বাঙালীর চেতনাকে উজ্জীবিত করে তোলে পহেলা বৈশাখ। আমরা মেতে উঠি আনন্দ-উৎসবে। বাংলা নববর্ষ জাতীয় ঐক্যের অঙ্গীকারবাহী। মানুষ মাত্রই উৎসব প্রিয় আর পহেলা বৈশাখ বাঙালীর প্রাণের উৎসব। নব সাজে নব আমেজে হৃদয়-মন ভরিয়ে দিয়ে প্রতিবছর বৈশাখ কড়া নাড়ে বাঙালীর জীবনে। প্রাণের কী হুল্লোড়! উৎসবের আনন্দে মেতে উঠতে আমাদের ভালো লাগে। এই ভাল লাগার অনুভূতির প্রকাশ; সর্বপরি মানব সংস্কৃতির দীপ্তময় প্রকাশ। আমরা উৎসব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে প্রকাশ করি। জীবনের চেতানাকে ধারণ করি এবং পালন করি। পহেলা বৈশাখ বাঙালী জাতির সার্বজনীন মিলনমেলা। সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মান-অভিমান ভুলে গিয়ে নতুনকে বরণ করে নেবার অঙ্গীকার। পহেলা বৈশাখে জরাজীর্ণতা ও পুরাতনকে পিছনে ফেলে নতুনকে আহ্বান করা হয় নতুন চেতনালোকে। অতীতের ভুল-ত্রুটি ও ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির আশায় আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করা হয় নতুন বছর।

বাংলা সনের প্রবর্তনের ইতিবৃত্তি : পহেলা বৈশাখ বা বাংলা সন চালু হওয়া বা প্রবর্তন প্রসঙ্গে ব্যাপক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকারেই এর সূত্রপাত এবং এর মর্মমূলে ছিলো বাংলার কৃষি ব্যবস্থা। খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। এই জন্যে তিনি প্রচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ অনুসারে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতি বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ আমীর ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌর সন ও আরবী হিজরি সনের ওপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম প্রবর্তন করেন। এর আগে ভারতবর্ষে গুপ্তাবদ, শতাব্দী, ইংরেজ, হিজরী, বিক্রমী সন চালু ছিল। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ বা ১১ মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। এই নতুন বর্ষপঞ্জিকাটি সম্রাট আকবরের রাজত্বের ঊনত্রিশতম বর্ষে প্রবর্তিত হলেও তা গণনা করা হয় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর থেকে কারণ এ দিন সম্রাট আকবর দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহন করেন। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলির সন, পরবর্তীতে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়। আকবরের সময়কাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন শুরু হয়। তখনকার দিনে প্রত্যেক চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাসুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে হত। এর পরের দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াত। সময়ের আবর্তনে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ব্যবসায়ীগণ নতুন-পুরাতন খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করতেন এবং নতুনভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করতেন। নববর্ষ বা নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে ঘিরে রয়েছে নানা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথকথা। কালক্রমে এভাবেই বাংলা সনের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ হয়ে ওঠলো বাঙালির সমন্বিত ও সার্বজনীন সাংস্কৃতিক মানচিত্রের একটি শক্তিশালী প্রতীক।

পহেলা বৈশাখ আনন্দের এক মিলনোৎসব: ধর্ম যার যার উৎসব সবার। বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে সত্য ও সুন্দরের শক্তিকে উপলব্ধি করার মহত্তম আয়োজন হল উৎসব। উৎসব আনন্দ প্রকাশ ও লাভের মাধ্যম। এক কথায় যাকে বলে আনন্দানুষ্ঠান। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা উক্তিতে উৎসবের মৌল ধারণাটি

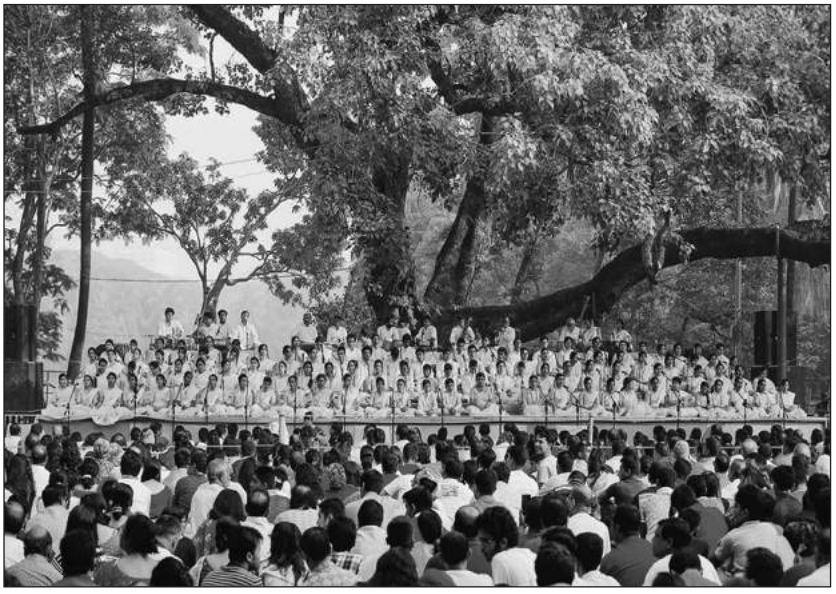

উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের রূপ বর্তমানে অনেকটাই পাল্টে গিয়েছে। এখন সারাদিনের নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে পালিত হয় পহেলা বৈশাখ।

হালখাতা : অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল 'হালখাতা'। এটি পুরোপুরি একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। প্রধানত ব্যবসায়ী মহলে এটি পালন করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়ী সমাজে পহেলা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষে হালখাতার প্রচলন বহুদিনের। এই সময় পুরানো দিনের হিসাবের খাতা বন্ধ করে নতুন খাতা খোলা হয়। সেই সাথে ক্রেতাদের মিষ্টি মুখ করানো হয়। নববর্ষের দিন ব্যবসায়ীরা পুরানো বছরের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করেন। এ জন্য অনেকে লাল কাপড়ের মলাটে এক বিশেষ খাতা ব্যবহার করেন, যাকে বলা হয় 'খোরো' পাতা। এই পরিষ্কার হয়েছে। তিনি বলেছেন, "প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী কিন্তু উৎসবে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করে মহৎ"। এই 'বৃহৎ' ও 'মহৎ' শব্দ দু'টি মানুষ সংশ্লিষ্ট। মানুষের সাথে মানুষের ঐক্য এবং মনুষ্যত্বের শক্তি উপলব্ধিতে হয় মহৎ। এক প্রাণবন্ত গতিময়তা সৃষ্টির মাধ্যমে উৎসব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় প্রাণ-প্রাচুর্য। প্রাণ বন্যায় প্লাবিত হয়ে মানুষ সহজেই অতিক্রম করে ক্ষুদ্রতার গন্ডিকে। হিংসা-বিদ্বেষ ও বিরোধ অনৈক্যের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে উৎসবই মানুষকে মৈত্রীভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তাই উৎসব মানুষের মঙ্গল শক্তির এক অবিনাশী সর্বব্যাপী আনন্দময় উপলক্ষ। সুপ্রাচীনকাল থেকে বাঙ্গালীও এই উৎসবের প্রাণ-প্রাচুর্যে নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছে। এই

ধারায় দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে আজ সে গেয়ে উঠেছে আত্মশক্তিতে বলীয়ান অর্থাৎ উৎসবই যুগিয়েছে শক্তি, দিয়েছে আত্মানুসন্ধানের পথ। পহেলা বৈশাখ সার্বজনীন উৎসবের আবেদন রাখে। বাঙালীর জাতীয় উৎসবে রূপ নিয়েছে পহেলা বৈশাখ।

পহেলা বৈশাখ বাঙালির জাগরণ : 'মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা' কবির গানের ভাষায় বৈশাখের শুরুতেই গাছে-গাছে প্রাণের সমাহার। নতুন পত্রপল্লবে সজীবতায় প্রাণের বিচ্ছুরণ। শাখায়-শাখায় ফুল ও ফলের বাহারি সমাহার। দিনটিকে সামনে রেখেই আমাদের উৎসব, আর সেই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রস্তুতির কোন সীমা থাকে না। প্রত্যেক বাঙালীর হৃদয়ে বৈশাখ উৎসব পালন করার আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। লালপেড়ে সাদা শাড়ি, কপালে লালটিপ, হাতে কাচের চুঁড়ি আর খোঁপা বা গলায় বেলী ফুলের মালার সৌরভ, এ যেন চিরায়ত বাঙালী ললনার প্রতিচ্ছবি। বৈশাখে সেই নারীর সাথে বাহারি পাঞ্জাবি পরা পুরুষের নান্দনিক সম্মিলন ঘটে নববর্ষের উৎসবে। প্রতি বছর ঢাকায় সবচেয়ে বড় আয়োজন বসে রমনার বটমূলে। নতুন শাড়ি আর পাঞ্জাবি পড়ে বটমূলে বর্ষ বরণের উৎসব শুরু হয় সমবেত কণ্ঠে 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো....।' যদিও আগের দিন পুরাতন বর্ষ বিদায় জানানোর মধ্যে দিয়ে পয়লা বৈশাখের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করা হয়। সকালে চারুকলা ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনায় মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। নববর্ষের শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্য আর সম্প্রীতির পহেলা বৈশাখ বাঙালীর জীবনে বয়ে আনে অনাবিল শান্তির ধারা। বর্তমান সময়ে বর্ষবরণ উৎসবে মঙ্গল শোভাযাত্রা, আলপনা আঁকাসহ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে পহেলা বৈশাখ আনন্দময় ও উৎসবমুখী হয়ে উঠেছে। এখন বৈশাখের অনুষ্ঠান সারা বাংলাদেশ জুড়ে লক্ষ্য করা যায়।

ঐতিহ্যময় পহেলা বৈশাখী: বৈশাখের উষ্ণ হাওয়ার ঝাঁপটা সমস্ত শোক-তাপ, গ্লানি-জরা দূর করে দেয়। সমস্ত জরা জীর্ণতা দূরীভূত হয়ে জীবনে আসে সজীবতা, নতুন করে বাঁচার নব এক অধ্যায়। বাংলা উৎসব যেন গ্রামীণ জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, ফলে সাধারণ মানুষের কাছে দিনটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া দিনটি শুরু হয় পান্তা-ইলিশের সাথে পেয়াজ-কাঁচামরিচ অথবা চিড়া-গুড় ও দই-মিষ্টি তো আছেই। নববর্ষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের আগমন ঘটে। একে অপরের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বর্তমানে বৈশাখী উৎসব পালনে পোশাকে নতুন ফ্যাশন যোগ হয়েছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী নানা কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। বৈশাখে অর্থনীতিও আজকাল চাঙা হয়ে ওঠে। তাই বাঙালী জাতীয় জীবনে বাংলা নববর্ষের আবেদন ভিন্নমাত্রার। তাই পহেলা বৈশাখে প্রত্যেকটি হৃদয়ে নব প্রত্যয়ে নিরন্তন বাজতে থাকুক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই অমর পংক্তিমালা- 'যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি/ অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।/ মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা/ অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।'

বাংলা সংস্কৃতিতে উৎসব ও বৈশাখী মেলা: সংস্কৃতি হল মানব সত্ত্বার সামগ্রিক প্রকাশ। মানুষের অন্তসত্ত্বার বাহ্যিক অভিব্যক্তি। আমাদের সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখতে পাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, পোষাক-পরিচ্ছেদ, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, এমনকি ধর্মীয় আচরণের মধ্যদিয়ে। উৎসব আয়োজনের মধ্যে বাঙালীর জীবনে আনন্দধারা আজও বহমান রয়েছে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে বাঙালী আজও তার চিত্তের ঐশ্বর্যের সন্ধান করছে। অর্জন করেছে বাঁচার প্রেরণাকে। বৈশাখী ফসল কাটার সময়। বাংলার কৃষকের আঙ্গিনা নতুন শস্যে পূর্ণ থাকে। এই জন্য বৈশাখকে বলা হয় ফসলী বছরের সূচনা লগ্ন। বাংলা নববর্ষের সব থেকে বড় আনন্দ অধুনালুপ্ত বৈশাখী মেলা। যে কোন গ্রাম প্রান্তের নদী তীরে বটের ছায়ায় বা বাজারে জমে ওঠে ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রামীণ মেলা। তাই তো নববর্ষকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে বৈশাখী মেলা। এটি মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা। এসব মেলায় কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রী, পণ্য, সাজ-সজ্জা, খেলনা এবং বিভিন্ন খাবারের সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। আরো থাকে পালাগান, জারিগান, বাউল, ভাটিয়ালী, কবিতা আবৃত্তি, পুতুল নাচ, যাত্রাপালা, চলচিত্র প্রদর্শনী, নাটক, নাগর দোলা প্রভৃতি। নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বৈশাখী মেলা বাঙালীর জাতীয় জাগরণের এক অম্বিশেষ তৎপরতার অব্যাহত উদ্যম। ছোট-বড় সকলেই বৈশাখী মেলার প্রতি বাড়তি একটা আনন্দ কাজ করে।

বাংলার প্রাণে উৎসবের আমেজ : বাংলা নববর্ষ বাংলাদেশের প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা একটি বৃহৎ উৎসব। পহেলা বৈশাখের আনন্দে ঘরে -ঘরে উৎসবের জয়ধ্বনি বেজে ওঠে। শুরু হয়ে যায় ব্যস্ততা। চারিদিকে আলোক সজ্জিত। লোকে লোকারণ্য বাংলার মাঠ-ঘাট, শহর-বন্দর। হৃদয়ে বইছে আনন্দের কলতান। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে কিশোরী-যুবতীরা চুলের খোঁপায় বা মাথায় ফুল দিয়ে সেজে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। মাথায় বিভিন্ন রকমের রঙিন কাপড়, কাগজের টুপি শোভা পায়। লাল পাড়ের শাড়ী-পাঞ্জাবী পড়ে। বৈশাখীর মেলায় যাওয়া, নাগর-দোলায় চড়া, ছবি তোলা আর প্রিয়জনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানানো। কেউ কেউ মেলা থেকে বাঁশের বা তাল পাতার বাঁশী কিনে ছোট ছেলে মেয়েরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এক সঙ্গে আনন্দ করে। তাদের মধ্যে অনেকে একতারা, দোতারা, ডুগডুগি, বাঁশী, ঢোল বাজিয়ে গান গেয়ে পরিবেশকে আনন্দময় করে তোলে। এই দিনে বাংলার গ্রাম-গঞ্জে দেখা যায়, মেলা, লাঠি খেলা, ঘোড়া দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, নৌকা বাইছ, হা-ডু-ডু খেলাসহ অন্যান্য আয়োজন।

পরিশেষে: বাংলা নববর্ষ শুধুমাত্র আনন্দ উৎসবই নয় বরং বাঙালীর চেতনায়, অনুভূতিতে ও জাতিগত সত্ত্বায় মিশে আছে, এই নববর্ষের এতিহ্য ও কৃষ্টি বিজড়িত প্রথাগুলো। নববর্ষ পালন সমাজ ও জীবনে সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রতি বছরই আমরা জরা-জীর্ণতা, মলিনতা মুছে ফেলে বরণ করি বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখকে। নববর্ষ উদ্‌যাপন হল সামাজিক ক্রিয়া। যার মাধ্যমে আমরা খুঁজে পাই আনন্দ, শান্তি, অনুপ্রেরণা, শক্তি, উদ্দীপনা, প্রেরণা। নববর্ষের শুভেচ্ছা মধ্যে দিয়ে পারস্পারিক সম্পর্ক সুন্দর হয়। বিনিময়ের একটি সুন্দর সুযোগ। তাই বাঙালী কৃষ্টি, সংস্কৃতি সুন্দর হোক, হোক পবিত্র। পহেলা বৈশাখ আমাদের কাছে নতুন বার্তা নিয়ে আসে। নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আয়োজন চলে প্রকৃতির বুকে ও মানব হৃদয়ের উচ্ছল অভিব্যক্তিতে। নববর্ষ বয়ে আনুক নিত্য-নতুন বন্ধন ও মিলন। যুগে যুগে নববর্ষ আনুক সার্থকতা। ১৪২৮ বঙ্গাব্দ আমাদের জন্য শুভ, সুন্দর ও শান্তিময় হোক। তাই শেষ করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -এর 'নববর্ষে' কবিতার মাধ্যমে। তিনি লিখেছেন, "নিশি অবসানপ্রায়, ওই পুরাতন বর্ষ হয় গত!/ আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন করিলাম নত।/ বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও, ক্ষমা করো আজিকার মতো/ পুরাতন বরষের সাথে/ পুরাতন অপরাধ যত।"

তথ্যসূত্র

* বাংলাপিডিয়া: পহেলা বৈশাখ, সমবারু চন্দ্র মহন্ত, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক
* সোসাইটি, ঢাকা, মার্চ ২০০৩।
* https://www.prothomalo.com.

আমাদের সংস্কৃতি ও বাংলা নববর্ষ

ডোনাল্ড স্যামুয়েল গমেজ

সংস্কৃতি হচ্ছে কোন জাতি বা জনগোষ্ঠির জটিল সামগ্রিক বৈশিষ্ট। অর্থাৎ জ্ঞান, বিশ্বাস, বিকাশ, সামাজিক আচরন, খ্যাদাভাস, নৈতিকতা, শিল্প, ভাষা, আচার-আচরণ, প্রথা ও আইন, মনোভাবের বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যম ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি এই সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। সহজ ভাষায় বলতে গেলে যে বৈশিষ্টের মধ্যদিয়ে একটি জাতির বা গোষ্ঠির আত্মপরিচয় ঘটে তাই সংস্কৃতি। যদিও পৃথিবী ব্যাপি একই রক্ত-মাংসের মানুষের বসবাস কিন্তু বৈচিত্রপূর্ণ বৈশিষ্টের কারণে বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে সংস্কৃতি আলাদা। যেমন পশ্চিমা সংস্কৃতি, প্রাচ্য সংস্কৃতি, ল্যাটিন সংস্কৃতি, মধ্যপ্রাচ্যিয় সংস্কৃতি, আফ্রিকান সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতি। স্বরুপ যাই হোক না কেন সংস্কৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল, কালে-কালে তার রূপ পরিবর্তীত হয়। এছাড়াও নৃতাত্বিক বিভিন্ন বিষয়, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট ও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা সংস্কৃতির পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করে।

আমরা বাঙ্গালি জাতি, আমাদেরও নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। বাঙ্গালি সংস্কৃতির সাথে অন্যান্য ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতির সাথে মিল থাকলেও তা স্বতন্ত্র। সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জ্ঞান, আচার-আচরন, বিশ্বাস, প্রথা ও রীতিনীতি, নীতিবোধ, সামষ্ঠিক মনোভাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস, মিশ্রজাতিগত মূল্যবোধ ও কৃষ্ঠি বাঙ্গালি সংস্কৃতির অন্তর্গত। হাজার হাজার বছরের নৃতাত্বিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠি, উপ-গোষ্ঠি বা শাখা-গোষ্ঠি, নানা শ্রেনীর মিলন, পারম্পারিক প্রভাব ও সমন্বয়ের ফলে গড়ে উঠেছে এই বাঙ্গালি সংস্কৃতি।

আমরা যদি একটু সচেতন ভাবে আমাদের শেকড়ের সন্ধান করি ও জানতে চেষ্টা করি কিভাবে পহেলা বৈশাখের উদ্ভব কিংবা বাংলা সন গননাই বা কোথা থেকে উদ্বুদ্ধ আর নববর্ষ উদ্‌যাপন কিভাবে আমাদের বাংলা সংস্কৃতির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত, আমাদের সকল ভ্রম দূর হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। কৃষিকার্যের সাথে সম্পর্কিত এই নববর্ষ উৎসব মূলত ছিল ঋতুনির্ভর উৎসব। মুঘল সম্রাট আকবর কৃষিকাজ ও খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ কিংবা ১১ মার্চ বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। কারণ মুঘল সম্রাটদের অনুসৃত হিজরী সন চন্দ্রনির্ভর হওয়ায় কৃষি ফলনের সাথে গরমিল হতো আর আগাম কর ও

খাজনা আদায় কৃষকদের জন্য ছিল কষ্টসাধ্য। যেহেতু সৌর সন অনুযায়ী কৃষিকার্য পরিচালনা হত আর হিজরী সন অনুযায়ী খাজনা আদায় করা হত তাই বাৎসরিক দিনের বিচ্যুতি পাওয়া যেত প্রায় ১১-১২দিন। এতে খাজনার হিসাব করাও দূরুহ ছিল। এই সমস্যার যুগান্তকারী সমাধান হিসাবে মুঘল সম্রাট আকবরের নির্দেশে রাজকীয় জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহ সিরাজী সৌর সন ও হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে বাংলা সন বিনির্মাণ করেন। কার্যত এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসন আহোরনের সময় থেকে অর্থাৎ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর থেকে। তারিখ-এ-এলাহী হয়ে উঠে বাংলা সন। প্রথমে তা ফসলি সন নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু তা পরবর্তীতে সম্রাট আকবরের সময়ে বঙ্গাব্দ হয়। সেই সন অনুশারে চৈত্রমাসের শেষদিন পর্যন্ত বাংলার কৃষকেরা জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য ভূ-স্বামীদের খাজনা পরিশোধ করতো। পরেরদিন নববর্ষে ভূ-স্বামীরা কৃষকদের মিষ্টিমুখ করাতেন। আয়োজন করা হতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও লোকজ মেলা যা পরবর্তীতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত হয়ে আজকের এই নববর্ষ উৎসবে রূপ নেয়।

বর্তমান সময়ে আমরা দেখি প্রতিটি বাঙ্গালি এই নববর্ষের দিনটি পালন করে অনেক আরম্বরের সাথে। নতুন পোষাকে সবাই মিলিত হয় নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনে। সারা দেশ ব্যাপি নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে পালিত হয় বাংলা বর্ষবরণ। কৃষকের ঐতিহ্য ও বাঙ্গালি সংস্কৃতির প্রাণের উৎসবকে কেন্দ্র করে শহরে কিংবা গ্রামাঞ্চলে বৈশাখী মেলা, বইমেলা ও ঘোড়ামেলা, লোকজ মেলা বসে, প্রদর্শীত হয় নানা কৃষিজ পণ্য, কুটির শিল্প, হস্ত শিল্প ও মৃত শিল্প । ঢাকায় রমনা বটমূলে ছায়ানটের প্রভাতি অনুষ্ঠান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের মঙ্গল শোভাযাত্রা তো এখন বাংলা বর্ষবরণের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এ আনুষ্ঠানিকতা শুধুই উৎসব অনুষ্ঠান নয়, বাঙ্গালি জাতির অস্তিত্বের প্রকাশ, ঐতিহ্যের প্রকাশ, ধর্মের ধুয়োতোলা অপশাসনকে ও বাঙ্গালি সংস্কৃতির উপর শকুণচক্ষ্যুর প্রভাব অগ্রাহ্য করে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালি সংস্কৃতিকে জাতীয় জীবনে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াশ। উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই পাকিস্তানী অপশাসন এবং বাংলা ও বাঙ্গালির উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান কিংবা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের স্বপক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের কতগুলো বড়-ছোট ভাইদের প্রচেষ্টায় মঙ্গল শোভাযাত্রা যে আজ এমন জনস্রোতে রুপ নেবে তা কেউ ভাবেনি আগে। তখন থেকে আজ অবধি প্রতি বছর এই আনুষ্ঠানিক আন্দোলনের অনুশীলন রূপ নেয় প্রথায়। অসাম্প্রদায়িক ভাবে সকল বাঙ্গালি যোগদান করে এই আনুষ্ঠানিকতায়। বিশ্বের যে সকল স্থানে এই বাঙ্গালি জাতির পদচিহ্ন পাওয়া যায় সেখানেই মানব কল্যাণ ও নব জীবনের প্রতীকরূপে পালিত হয় এই পহেলা বৈশাখ যা বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্বের মাঝে তুলে ধরে।

আমরা অনেকে আমাদের নিজস্বতা ভুলে গিয়ে আমাদের হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতিকে পাশ্চত্য মোড়কীকরণ ও ধর্মীয় মোড়কীকরণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। কিন্তু তাতে এখনো গ্রহণ লাগেনি বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সকল ভ্রান্ত ধারনা ভুলে আমাদের উচিত আমাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখা। সকলে মিলে মিশে এক হয়ে পুরাতনকে ভুলে নতুনের আশায় আমাদের প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন করা। নব উদ্দমে ও নব জীবনের তরে নববর্ষকে আলিঙ্গন করা, উদ্‌যাপন করা। সকলকে আজকের দিনে আমার ও সমগ্র বাঙ্গালি জাতির পক্ষ্য থেকে জানাই অফুরন্ত শুভেচ্ছা, শুভ নববর্ষ!!

সামাজিক রাজনীতি ও দেশীয় খ্রিস্টান সমাজ

চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু

(পূর্ব প্রকাশের পর)

মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ঃ

পাকিস্তানের বিরোধিতাকারী বাঙ্গালি সেনাসদস্যগণ ভারতে প্রবেশ করলে, ভারতীয় সরকার বিএসএফ কে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। অতপর, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ ৪ এপ্রিল, '৭১, তেলিয়াপাড়ায় মেজর খালেদ মোশাররফের অস্থায়ী দপ্তরে মিলিত হন। গুরুত্বপূর্ণ সভায় সংসদ সদস্য কর্ণেল (অব.) এমএজি, ওসমানীর ওপর নেতৃত্বভার অর্পণ করত তাঁকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অতপর, তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

২৯ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল দিনাজপুর মুক্ত থাকায়, ইপিআর বাহিনী সদস্য জর্জ দাস দলছুট ইপিআরদের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে বিপ্লবী যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেন। ভারতে প্রবেশ করে তিনি শিববাড়ী ইয়ুথ ট্রেনিং ক্যাম্প "গড়ে তোলে প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আন্তরিকতার কারণে প্রায় পাঁচশত যুবক "জর্জ বাহিনী" নামে সংঘবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেন। ময়মনসিংহ এলাকায় উইলিয়াম ম্রংপ্লাটুন কমাণ্ডার এবং থিওফিল হাজং, বংকিম দ্রং, সমর সাংমা গারো এলাকায় অবস্থানরত পাকিস্তানী সেনাদের বিরামহীন আঘাতে আতঙ্কিত করে তুলে ছিলেন।

১০ এপ্রিল, ত্রিপুরার রাজধানী শহর আগরতলায়, নির্বাচিত জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত কতিপয় সদস্যকে নিয়ে জনাব তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে, বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হয়। অত:পর, ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলাধীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলায় (মুজিবনগর) সকাল এগারোটায়, এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে, বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রীপরিষদ ঘোষণা করেন।

মন্ত্রী পরিষদের শপথ গ্রহণকালে সকল সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল চেয়ার-পটবিল পালপুরোহিত ফাদার ফ্রান্সিস এ, গমেজ (বিশপ) সরবরাহ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি পবিত্র বাইবেল পাঠ করেছেন। অতপর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত বাইবেল পাঠ করেছেন ডেভিড প্রণব দাস। সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন সমর দাস। বঙ্গবন্ধুর ব্যাখ্যায় যারা, "বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন, বাংলায় কথা বলেন তারা সবাই বাঙ্গালি"। তার আহবানে সাড়া দিয়ে দেশের বাঙ্গালি খ্রিস্টানদের পথধরে আদিবাসী খ্রিস্টানরাও মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। দিনাজপুরের সুরেন মালো কুখ্যাত জামাত নেতা সাগর মণ্ডল এবং একজন পাঞ্জাবী মেজর-এর মস্তক ছেদন করার গৌরব অর্জন করলে, কৃতিত্বস্বরূপ তাকে স্বীয়বাহিনীর ঘাটি থেকে ৪৫০ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিলো। বাঙ্গালি খ্রিস্টানদের পথ ধরে একই সাথে প্রায় দেড়শো আদিবাসীর নেতা হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ধীরেণ মালো, পাত্রাস মারান্ডী ও আলবেরেকুশ হাসদার ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলো। চট্টগ্রামে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান জুয়েল সুবিয়াম ও টেরেন্স রিবেরু, হিউবার্ট টসকানো, ইসিডোর লালা হালদার এর ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার তৎকালিন রূপগঞ্জ এলাকায়-সমর লুইস কস্তা, সন্তোষ রড্রিক্স, সুনীল ডি' ক্রুজ, সুনীল ইগ্নেসিউস ডি'কস্তা, পেট্রিক কিরণ রোজারিও, শান্ত বেঞ্জাবিন রোজারিও, এন্ড্রো ডি' কস্তা, ডানিয়েল ডি'কস্তা, আব্রাহাম অরুণ ডি'কস্তা, সুনীল ষ্টেনলী ডি'কস্তা, আলফন্স রবীন ডি'গমেজ, পরিমল ডি'কস্তা, সিপ্রিয়ান রিবেরু, হিউবার্ট সন্তোষ ডি'কস্তা, বিধান কমল রোজারিও, বিজয় ভিনসেন্ট রিবেরু, সন্তোষ লুইস গমেজ, হেনেসি কস্তা, সুবাস পিউরিফিকেশন, শ্যামল ডি' কস্তা, বিজয় এম, পিরিচ, আগষ্টিন ছেড়াও, প্রফুল্লা গমেজ, বার্ণাড রিবেরু (বারু), মন্টু ডি' কস্তা, আদম গ্রেগরী, অতুল ডি'কস্তা, ডেভিড ডি' রোজারিও, ইগ্নেসিউস সুশান্ত গমেজ, সুব্রত বনিফেস গমেজ, লরেন্স লরেন ডি' কস্তা, রবি কোড়াইয়া, ক্লেমেন্ট ডি' কস্তা ভূঞা, নিকোলাস গণছালভেজ, সেন্টু পালমা প্রমুখ। ঢাকার হিউবার্ট অরুণ রোজারিও, সিলভেস্টার নির্মল রোজারিও, নবাবগঞ্জ এলাকার ডেভিড হেনরী মজুমদার, এডুয়ার্ড কর্নেলিউস গমেজ, বাদল কোড়াইয়া, ইউজিন পিউস গমেজ, শীতল গমেজ, যোনাস গমেজ, সুনীল গমেজ ছাড়াও যারা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, রাঙ্গামাটিয়ার রবি ফ্রান্সিস ডি' কস্তা, অনিল রেজিনাল্ড গমেজ, মঠবাড়ীর বাবুল পেরেরা, আগষ্টিন পেরেরা, নাগরীর আন্তনী পিউরিফিকেশন, গোপালগঞ্জে সুবাস বিশ্বাস, ঝিনাইগাতীর আরেং রিছিল, পরিমল দ্রং, পাবনায় আহত মুক্তিযোদ্ধা আদম ডি' কস্তার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটোর জেলার সিলভেষ্টার কস্তা, এডুয়ার্ড ডি' রোজারিও, উইলিয়াম অতুল কুলুঙ্কুনু মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

বিশিষ্টজনদের শাহাদাত বরণ

অরাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃত খ্রিস্টানদের রাষ্ট্রীয় কাজে বিরোধিতা করার কোন আলামত না থাকায়, তৎকালীন পাকিস্তান সরকার দেশীয় খ্রিস্টানদের কোন কাজে বাধা দেয়নি বটে! ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় অসংখ্য আদিবাসীদের বাসস্থান হওয়ার কারণে, কুট কৌশলগত ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী গারো, ওরাও, কোচ, পাহাড়ী, হাজং, সাঁওতাল, চাকমাদের এলাকাগুলো ভারত-পাকিস্তানে বিভক্ত ছিলো। সীমান্ত এলাকার খ্রিস্টীয় ধর্মপল্লীগুলোতে আত্মিক অনুশীলনে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে এপার-ওপার বাংলায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজস্ব গির্জা, বিদ্যালয়, আলাদা ও নিজস্ব দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ফলে আদিবাসী খ্রিস্টান যুবকদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা সুবিধাজনক হয়ে উঠেনি। চোরাচালান ব্যবসার মিথ্যা শ্রমিক হিসেবে এরা অযথা অন্যায়ভাবে কারাগার বা হাজতবরণ করেছে। ফলে আত্মরক্ষার্থে ওরা পাকিস্তান বিরোধী রাজনীতিকে সহজেই সমর্থন করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুর তাৎক্ষণিক আহ্বান, "বাংলাদেশে যার জন্ম এবং বাংলায় কথা বলে সে-ই বাঙ্গালি।"র সাথে একাত্ম ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

দিনাজপুরের রুহিয়া মিশনের ফাদার অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি লুকাশ মারান্ডী, গৃহহারা সাধারণ মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ায়, স্থানীয় দালালরা তাঁকে জয়বাংলার লোক বলে হানাদার পাক-বাহিনীর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে। ২১ এপ্রিল খাকি পোশাক পরিহিত চারজন পাঞ্জাবী মিশনে এসে, ফাদার লুকাশকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। একপর্যায়ে তাঁর সহকারী ফাদারের বাবুর্চি সৈনিকের চপেটাঘাত খেয়ে পালিয়ে গেলে ওরা ফাদারকে গুলি করে। ফাদারের কানের পাশে গুলি লাগায়, তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। দরেকান্ত দাস, বীরজ পিটার দাস ও যোসেফ দাস ফাদারের আক্রান্ত স্থানটিতে ব্যান্ডেজ করে, তাঁকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ইসলামপুর মিশনে মো'ষের গাড়ীতে করে নিয়ে যাবার পথে, ফাদার লুকাশ প্রাণ হারান। অতপরঃ ইসলামপুর মিশনে আদিবাসী যাজক শহীদ ফাদার লুকাশ মারান্ডীকে সমাহিত করা হয়।

ফ্রান্সের নাগরিক সালেসীয়ান সংঘভুক্ত সিস্টার মেরী ইম্মানুয়েল এস.এম.আই (১৯১৪-১৯৭১) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত এলাকায় গারোদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা দান করেছেন। ১৯৪৫ সনের ৫ ডিসেম্বর তিনি ময়মনসিংহ আসেন। বারোমারী ধর্মপল্লীতে তিনি লুর্দের রাণী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে চিকিৎসা সেবার কাজ করেছেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করে তিনি পাকিস্তানীদের কু-দৃষ্টিতে পড়েছিলেন। ৮ জুন, ১৯৭১ হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সে শেরপুর যাবার পথে সড়কে পুতে রাখা মাইন বিস্ফোরনে সিস্টার ইম্মানুয়েল শহীদ হয়েছেন। বারোমারীতেই তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়েছে।

মার্কিন নাগরিক ফাদার উইলিয়াম প্যাট্রিক ইভ্যান্স সিএসসি ছিলেন নবাবগঞ্জ এলাকাধীন গোল্লা ধর্মপল্লীর জনপ্রিয় যাজক। উদ্ভাস্ত ও মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। ১৯৭১ এর ১৩ নভেম্বর, ফাদার ইভ্যান্স গোল্লা থেকে নৌকাযোগে বজ্রগর যাবার পথে, নবাবগঞ্জ ক্যাম্পের পাক সেনারা তাঁকে ডেকে নিয়ে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে ধারাশায়ী করে, গুলি করে এবং বেয়নেট চার্জ করে ফাদারকে হত্যা করে। ওরা নিহত ফাদারের লাশ নদীতে নিক্ষেপ করেছিলো। পরে তাঁর লাশ উদ্ধার করে খ্রিস্টভক্তগণ গোল্লার কবরস্থানে সমাহিত করেন। **(চলবে)**

বাংলার জনপদ থেকে

ডিজিটাল আসক্তির বিড়ম্বনা

ফাদার সুনীল রোজারিও

ডিস এ্যান্টিনা আবিস্কারের পর বাংলাদেশে আমদানি নিষিদ্ধ ছিলো। ভিডিও ক্যাসেট রিসিভার বা প্লেয়ার আমদানিও নিষিদ্ধ ছিলো। এই নিষিদ্ধ পণ্যগুলো বিমান বন্দরে আটকের পর উৎসব করে ভাঙ্গতে দেখা গেছে। দুবাইয়ের আল মনসুর রের্কডিং কোম্পানির কপি করা ভিডিও ক্যাসেট একসময় বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রথমে ঢাকার মধ্যে সম্প্রচার সীমাবদ্ধ ছিলো। বিকল্প চ্যানেল না থাকায় ইয়োগা এ্যান্টিনার মাথায় নানা সাইজের এলোমিনিয়ামের হাড়ি পাতিল লাগিয়ে বাইরের টিভি চ্যানেল দেখার চেষ্টা করা হতো। তারপর এলো ডিস এ্যান্টিনা। এখন ডিস এ্যান্টিনা বিলুপ্তপ্রায়, ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার নেই, ক্যাসেট নেই, সিডি নেই। একটা ৬২ জিবির পেন ড্রাইভে বহু ভিডিও চিত্র ধারণ করা যায়। আবার সেটারও দরকার কী। ইউটিউবে তো সবই পাওয়া যায়। পার্সোনাল কম্পিউটার বাংলাদেশে আমদানিতে ট্যাক্স ছিলো। এখন সাথে ল্যাপটপ আছে কিনা কেউ জিজ্ঞেস করে না। বাংলাদেশি ভ্রমনকারিদের মোবাইল ফোন আমদানি নিষিদ্ধ করা সত্বেও তা মনে হয় বন্ধ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। নিউ ইয়র্ক শহরে লক করা মোবাইল ফোন বাংলাদেশে এনে আনলক করছে। যে দেশে অবৈধ ঘোষিত Voice Over Internet Protocol নির্মূল এখনো বোধহয় সম্ভব হয়নি, সেদেশে মোবাইল ফোন আমদানি বন্ধ কী করে সম্ভব। আরো হয়তো মেলা ধরণের ডিভাইস থাকতে পারে, যার মধ্যদিয়ে বিদেশ থেকে আসা কল টাইম চুরি করা যায়। তবে সরকার এগুলো বন্ধের জন্য চেষ্টা করছেন।

আর একটি বিড়ম্বনা আছে- সেটি হলো কম্পিউটার ভাইরাস। একটি কথা প্রচলিত আছে, যারা কম্পিউটার ভাইরাস নির্মূল করার প্রোগ্রাম তৈরি করে, তারাই আবার ভাইরাস তৈরি করে। সে যাক গে সেসব কথা। এই সবকিছু মিলিয়েই এখন ডিজিটাল যুগ।

তবে সোস্যাল মিডিয়ার বা কমিউনিকেশনের যতো ডিভাস/ প্রযুক্তি থাক না কেনো- আজকের দিনে বিস্ময় হলো মোবাইল ফোন। কারো মোবাইল ফোন নেই- কল্পনাও করা যায় না। বিশ্বে আর কোনো ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস এতো জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। কারণ হলো বস্তুটি সর্ব কাজের । ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে সিটিসেল মোবাইল ফোন লাইসেন্স পায় এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে অপারেট শুরু করে। এক সময় বাংলাদেশে নকিয়া কোম্পানির শুধুমাত্র ফিচার ফোন বাজারে পাওয়া যেতো। এখন অনেক প্রতিষ্ঠানের তৈরি ফোন পাওয়া যায়- যার বেশির ভাগই এন্ড্রোয়েড, টাচ্‌ফোন বা স্মার্টফোন। এই স্মার্টফোনগুলো এতো স্মার্ট যে একদম অলরাউণ্ডার বা সব কাজের কাজী। ডিজিটাল বিড়ম্বনা এই স্মার্টফোন নিয়ে।

স্মার্টফোনের কারণে সোস্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা বিপদসীমা অতিক্রম করছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে বলা হচ্ছে, অল্পবয়সীদের মধ্যে যে স্ক্রিন অ্যাডিকশন তৈরি হয়েছে, তা বেড়েই চলছে। অ্যাডিকশন অর্থ হলো আসক্তি- যা মাদকাসক্তাদের বেলায় বলা হয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে অল্পবয়সীরা দিনে পাঁচ থেকে আট ঘন্টা স্মার্টফোন যন্ত্র হাতে নিয়ে টিপাটিপি করছে। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, এতে করে শিশু-কিশোরদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে আর তাদের আচরণে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ ডিজিটাল যন্ত্রের শিক্ষণীয় ভূমিকার চেয়ে এসব যন্ত্রের প্রতি তাদের আসক্তি বেশি। মনোবিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে আরো বলেন, শিশুদের হাত থেকে ডিভাইস কেড়ে নিলে সেই শূন্যতা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ গঠনমূলক ও আনন্দদায়ক বিকল্প ব্যবস্থা না করে শিশু-কিশোরদের স্ক্রিন টাইম কমিয়ে দিলে ওরাও বিকল্প ব্যবস্থার দিকে পা বাড়াবে।

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এখন দেখা যায়- কিছু ছেলে মেয়ে ব্রিজের রেলিং বা মোড়ে বসে স্ক্রিনের দিকে একযোগে মনোযোগী হয়ে আছে। কারো সঙ্গে কারো কথা নেই। বাইরে ঘুরতে যাওয়া, সামনা সামনি বসে আড্ডা বা ইন্টার অ্যাকশানে মনোযোগ নেই। এতে করে- বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে- যোগাযোগ মাধ্যমের ভাষায় যাকে বলে 'ফিল্ড অব এ্যাক্সপেরিয়েন্স' দুর্বল হয়ে আসছে। ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রকৃতপক্ষেই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বদলে দিচ্ছে। অনেকে আবার আশঙ্কা করছেন যে, এতে করে কি ঈশ্বরের সঙ্গেও মানুষের সম্পর্ক বদলে যাবে ?

এই বিষয়ে ফেসবুকের প্রথম চেয়ারম্যান সিয়ান পারকার বলেছিলেন, এটা আমাদের সমাজের স্বাভাবিক সক্রিয়তা নষ্ট করে দিচ্ছে। সামাজিক আলাপ-আলোচনা নেই, পারস্পরিক সহযোগিতা নেই, আছে ভুল তথ্য আর মিথ্যা। ফেসবুকের সাবেক এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট আথেনা শাভারিয়া বলেছেন, "আমি নিশ্চিত, আমাদের ফোনের মধ্যে বাস করে শয়তান, সে ছেলেমেয়েদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে।" আমেরিকার রোবটিকস ও ড্রোন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী ক্রিস অ্যাণ্ডারসন বলেছিলেন, "আমরা ভেবেছিলাম, এই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এটা সরাসরি চলে যাচ্ছে বিকাশমান মস্তিষ্কের প্লেজার সেন্টারগুলোতে। সাধারণ মা-বাবার পক্ষে ব্যাপারটা বুঝতে পারা একেবারেই অসম্ভব।"

ইউনিসেফ বলছে, শিশুরা বেড়ে উঠতে পারে ভুল তথ্য মিশ্রিত ডিজিটাল পরিবেশের বাসিন্দা হয়ে। এই ভুল তথ্য শিশুদের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠবে। অনলাইনে ভুল তথ্য ইতিমধ্যে শিশুদের যৌন হয়রানি, অমর্যাদা এবং অন্যান্য নিগ্রহের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলছে। আবার অতিমাত্রার উদারপন্থীরা বলছেন, একুশ শতকে এমন রক্ষণশীলতা বেমানান। তারা বলেন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যাত্রা বরাবরই সামনের দিকে। তাই নতুন প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহার করলে মানবজাতি উপকৃত হবে- সেই পথ মানুষ নিজেই বের করে নিবেন। এই নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কিছু নেই।

এতোক্ষণ ধরে পশ্চিমা দেশের কথাই বলছিলাম- কারণ আমরা পশ্চিমা দেশে কি হচ্ছে তা জানি না আবার নিজের দেশে কি হচ্ছে তাও জানি না। আমাদের দেশেও ডিজিটাল যন্ত্রের প্রতি আসক্তি বা ব্যবহারের প্রবণতা ঐ দেশগুলোর মতোই। শুধু তফাৎটা হলো- পশ্চিম দেশের অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন, ডিজিটাল আসক্তি থেকে সন্তানদের উদ্ধার করার উপায় খুঁজছেন- আর আমাদের এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তাই এখন থেকেই সতর্ক হওয়ার বিকল্প নেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিভাবকদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। সন্তানদের সঙ্গে বাস্তব জীবন গোপন না করে, খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা॥

বাংলা নববর্ষে নাতির কাছে দাদু ফাঁসে

মাস্টার সুবল

ছোট অনিকের বৃদ্ধ দাদু অলক, বহুমূত্র আর উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন। ডাক্তারের চিকিৎসায় ঔষধ সেবন আর বিভিন্ন নিয়ম পালন করছিলেন। ধূমপান, মদপান না করার জন্য তার উপর ছিল ডাক্তারের চরমতম আদেশ।

সেদিন ছিল পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ। নাতি অনিক সকালে দাদুকে প্রণাম করার পর বলে, দাদু, আজ বাংলা নববর্ষ। তুমিতো এখনো বিভিন্ন রোগে গুরুতর অসুস্থ। আজ এ নববর্ষে তোমার কি খেতে মন চায় আমাকে বল দাদু। আমি বাবাকে বলব, তোমার জন্য তা কিনে আনতে। দাদু নাতির এ কথা শুনে নাতিকে বলেন, ঈশ্বর তোর সর্বদিকে মঙ্গল করুন। তুই ছোট হয়ে আমাকে এমন একটা কথা বললি, যেমন কথা আমার জীবনে আর কেউ কোনদিন বলেনি। শোন ভাই, এখন আমার তেমন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা নাই। তোর কথাটা শুনেই আমার অন্তরটা তৃপ্তি পেয়েছে। তবে তোর দ্বারা আমার একটা ইচ্ছা যদি পূরণ হয় তাহলে এ বৃদ্ধ বয়সে, মৃত্যুর আগে অনেক আনন্দ পাব। নাতি শুনে বলে, তোমার ইচ্ছাটা এবার বল দাদু। দাদু বলেন, আমি জীবনভর ধূমপান করে আসছি। আর এখন ডাক্তারের আদেশে তা বন্ধ থাকায় মনে বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি। নে ভাই, তোকে একশ টাকা দিচ্ছি, তুই অতি সাবধানে দক্ষিণ পাড়ার ঠান্ডার দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে এনে দে ভাই। খুব সাবধানে আনবি কিন্তু, বাড়ির কেউ যেন কিছুতেই জানতে না পারে, বুঝলি? এবার নাতি একটু কঠিন হয়ে দাদুকে বলে, দাদু, ডাক্তারের আদেশে তুমি মনে হয় মানসিক দিকে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছ, তাই না? তবে তুমি আমার কাছে যেভাবে যা চাচ্ছ, আর আমাকে যা করতে বলছ, তা গুরুতর অপরাধের সমতুল্য। আবার ডাক্তারের আদেশ অমান্য করে তুমি যা করতে চাচ্ছ, তাও গুরুতর অপরাধের সমতুল্য। তাহলে এবার বুঝলে দাদু? দাদু নাতির কথা শুনে, বালিশের উপর মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে পরেন। বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, হে ভগবান, তুমি আমায় একি শাস্তি দিলে, একটি বিড়ি পর্যন্ত খেতে পারবো না? যাহোক, আমার উপর তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। নাতি দাদুর মাথায় হাত বুলিয়ে, কপালে চুমু খেয়ে, নববর্ষের শুভেচ্ছা জানায়॥

পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা

অন্তর দাস

বসন্তের প্রত্যাবর্তনে
আজি মন আঙ্গিনায় উঁকি মারে
পয়লা বৈশাখের নব প্রহর,
নব নব ক্ষণে
নতুন মনে
আজি সহস্র প্রাণের
স্পর্শ ঘটায় মনে।

ঝরুক মলিন ব্যর্থতা
ঘুচুক দীনতা,
আজি বিশ্ব মহামারীর করোনার ক্ষণে
কাটুক প্রাণের খেলা
নব প্রাণে সাজুক
ধরনী স্রোতার মনলতা।

তাই তো
মোদের জানাই নতুন বর্ষ
তারই নববর্ষের শুভেচ্ছা
হে নবীনেরা লও মোর
মন ফুলের শুভেচ্ছা
স্রষ্টার সৃষ্টিরে লয়ে
জরা জীর্ণতা কাটিয়ে
নতুন হইয়া বাহির হও তোরে লইয়ে।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
হলিক্রস স্কুল
২য় শ্রেণী

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রিন্স ফিলিপের মৃত্যুতে পোপ মহোদয়ের সমবেদনা

পোপ মহোদয়ের পক্ষ থেকে ভাতিকান সিটি রাষ্ট্রের সেক্রেটারী কার্ডিনাল পিয়েত্ত পারোলিন বৃটেনের রাণী ২য় এলিজাবেথের কাছে এক টেলিগ্রাফ বার্তা প্রেরণ করে জানান, আপনার স্বামী এডিনবার্গের রাজপুত্র প্রিন্স ফিলিপের মৃত্যু সংবাদ জেনে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস খুব দুঃখ পেয়েছেন। আপনার ও রাজ পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি তিনি তাঁর আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছেন। কার্ডিনাল তার বার্তায় তুলে ধরেন, বিবাহ ও পরিবারের প্রতি প্রিন্স ফিলিপের বিশ্বস্ততা ও ভালবাসা; জনসেবায় তার বিশেষ কীর্তি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের শিক্ষা ও অগ্রগতির জন্য তার নিবেদনের কথা। রাণী, আপনার ও দুঃখকাতর আপনার পরিবারের সকলের প্রতি পোপ মহোদয় শান্তি ও সান্ত্বনার আশীর্বাদ দান করছেন।

প্রিন্স ফিলিপ ৯৯ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি একমাস হাসপাতালে কাটান এবং মার্চের ১৬ তারিখে হাসপাতাল থেকে অব্যাহতি নিয়ে উইন্ডসর প্রাসাদে থাকছিলেন এবং এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। গ্রীক ও ডেনিস রাজ পরিবারে জন্ম প্রিন্স ফিলিপের। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গ্রীসের করফো দ্বীপে তাঁর জন্ম। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাণী ২য় এলিজাবেথের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বৃটিশ রাজ পরিবারে তিনিই দীর্ঘসময় রাণীর সাথে অবস্থান করেন। প্রিন্স ফিলিপ ছিলেন একজন আগ্রহী ক্রীড়াবিদ যিনি দেশকে ভালবাসতেন। তিনি ৪জন সন্তান, ৮জন নাতি-নাতিন এবং ৯জন পুতি-পুতিন রেখে গেছেন।

মিয়ানমারের জন্য প্রার্থনার আবেদন চার্চ ইন নিডের (ACN)

আন্তর্জাতিক কাথলিক দাতা সংস্থা চার্চ ইন নিডের (Aid to the Church in Need: ACN) দরিদ্র, নির্যাতিত ও শোষিতদের সাহায্য করে যাচ্ছে, তারা বিশ্বব্যাপী প্রার্থনার আবেদন করছে মিয়ানমারের জন্য, যা ২মাস আগে সেনা অভ্যুত্থানে কঠিন সময় কাটাচ্ছে। সারাবিশ্বের খ্রিস্টানগণ গভীর সহানুভূতির সাথে মিয়ানমারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। তাই আমরা পোপ মহোদয়ের আহ্বানের সাথে একাত্ম হয়ে বলছি এই সহিংসতা বন্ধে আসুন আমরা একত্রে প্রার্থনা করি। টমাস হেইন- গেলপ্রেন, নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, (Aid to the Church in Need: ACN) সকলের কাছে এ আহ্বান রাখেন। মার্চ মাসে পোপ মহোদয় সহিংসতা ত্যাগ করে সংলাপে বসতে সামরিক জান্তাকে আহ্বান করেন। ইতোমধ্যে গণতন্ত্রকামী ৬১৮ জনকে হত্যা করা হয়। ২৯৩১ জনকে আটক করা হয়। বিগত সপ্তাহে সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা আরো বৃদ্ধি পায়। তারা রাস্তায় কাউকে দেখলে গুলি করার বৈধতা পায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি মিয়ানমারের সমস্যা সমাধান হচ্ছে না। তবে আশাপ্রদ দিক হচ্ছে সন্ন্যাসব্রতিনী সিস্টার যখন হাঁটু গেড়ে সেনাদের গ্রুপকে আটকে দেয়, কাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট পুরোহিত যখন একত্রে আলোচনা করে পুলিশ বাহিনী ও বিক্ষোভকারীদের আলাদা করতে পারে। আশা করি এই ধরনের ঘটনাগুলো কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেও হৃদয়কে কোমল করতে সহায়তা করবে। আর তার জন্য সবাইকে প্রার্থনা করতে হবে।

বাংলাদেশ মণ্ডলীর অকৃত্রিম বন্ধু কার্ডিনাল এডোয়ার্ড ক্যাসিডি তাঁর সেবাকাজে স্মরিত হবেন মণ্ডলীতে

১০ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ অস্ট্রেলীয় মণ্ডলীসহ বিশ্বমণ্ডলী খ্রিস্টীয় ঐক্য কাউন্সিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল এডুয়ার্ড ইদ্রিস ক্যাসিডির মৃত্যুতে শোকাহত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ মার্ক কলেরিডজ বলেন, কার্ডিনাল ক্যাসিডি শুধু কূটনৈতিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতাই দেখাননি; তিনি মানবিক সততা ও সাধারণ জ্ঞানও প্রকাশ করেছেন। তাঁর সবকিছুতে সারল্য ছিল - মণ্ডলীর একজন কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তির সেই সরলতা যার চোখ দুটি যিশুতে স্থির ছিল।

কার্ডিনাল ক্যাসিডি ৫ জুলাই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে নিউ সাউদ ক্যাসেল, সিডনীতে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তার দাদু মারা যায় তখন কার্ডিনাল ক্যাসিডির পরিবার আর্থিক সমস্যায় পতিত হলে তিনি স্কুল ছেড়ে দিয়ে সড়ক পরিবহন সেক্টরে একজন জুনিয়র ক্লার্ক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাসিডি তার বিশপকে রাজি করান পুরোহিত হবার লক্ষ্যে সেমিনারীর পড়াশুনা করতে তাকে অনুমতি দিতে এবং ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ২৫ বছর বয়সে তিনি পুরোহিত হন। কয়েকবছর পরই ওয়াগ্‌গা ডায়োসিসে পরিবর্তিত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আইন শাস্ত্র কার্ডিনাল ক্যাসিডির পড়তে রোমে আসেন এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পন্টিফিক্যাল লাতেরান ইউনিভার্সিটি থেকে আইন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

কার্ডিনাল ক্যাসিডি

পুরোহিত হিসেবে কার্ডিনাল ক্যাসিডি ইণ্ডিয়া, আয়ারল্যাণ্ড ও পর্তুগালে কাজ করেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পোপীয় ডেলিগেট হিসেবে আমেরিকাতে যাওয়ার কথা থাকলেও আয়ারল্যাণ্ডে পোপের প্রতিনিধি পরিবর্তন হয়ে গেলে তাকে আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনেই থাকতে হয়। তবে কয়েকমাস পরেই তিনি আল-সালভাদোরের পোপের প্রতিনিধির কাউন্সিলর হয়ে সেদেশে যান। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে চীনে প্রো-নুনসির'র দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি আর্জেন্টিনাতে পোপের প্রতিনিধির কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে পোপের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে পোপের প্রতিনিধি হিসেবে কার্ডিনাল ক্যাসিডিই প্রথম দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়েই বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী বিশ্বমণ্ডলীতে ধীরে ধীরে পরিচিত হতে থাকে। বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি'র বিশপীয় অভিষেকের সময় তিনি প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র সাথে দিনাজপুরে উপস্থিত ছিলেন। বিশপ থিওটোনিয়াস জানান, কার্ডিনাল ক্যাসিডি বাংলাদেশ মণ্ডলীকে খুব ভালবাসতেন। অনেকেই তাঁর কাছে ও তাঁর বাসভবনে যেতে পারতেন। বাংলাদেশ মণ্ডলী ও ভাতিকানের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার ভিত তিনিই রচনা করেন। সর্বশেষ তেজগাঁও নতুন গির্জার উদ্বোধনের সময় ২২ জানুয়ারি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের বেশকিছু যুবককে পড়াশুনা ও জীবন উন্নয়নের জন্য বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন বাংলাদেশ মণ্ডলীর বন্ধু কার্ডিনাল ক্যাসিডি। সেই যুবকদের মধ্যে আছেন - কারিতাস এশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও কারিতাস বাংলাদেশের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক ড: বেনেডিক্ট আলো রোজারিও, রাজশাহীর মার্সেল কস্তা, মঠবাড়ীর সুনীল জর্জ কস্তা ও নাগরীর ছাইতান গ্রামের ইঞ্জিনিয়ার সেবাস্টিয়ান পিউরিফিকেশন, বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী।

বাংলাদেশের পরে লেসথো ও নেদারল্যাণ্ডে প্রো-নুনসিও এবং দক্ষিণ আফ্রিকা যখন বর্ণবাদে আক্রান্ত তখন তিনি সেখানে ৫ বছর পোপের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর খ্রিস্টীয় ঐক্য বৃদ্ধি বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পান এবং একই সাথে ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনের প্রেসিডেন্টেরও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সাধু পোপ ২য় জন পল তাঁকে কার্ডিনাল পদে উন্নীত করেন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। অবশেষে ১০ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ৯৬ বছর বয়সে তিনি স্বর্গবাসী হন।

অস্ট্রেলিয়ান বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ মার্ক কলেরিডজ স্মৃতিচারণ করে বলেন, কার্ডিনাল ক্যাসিডি বন্ধুবৎসল ও সকলের সাথে মিশতে পারা একজন দারুণ ব্যক্তিত্ব; বিশেষভাবে খ্রিস্টীয় ঐক্য দপ্তরে থেকে তিনি তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। সিডনীর আর্চবিশপ আন্তনী ফিসার, ওপি এক শোকবার্তায় বলেন, কার্ডিনাল ক্যাসিডি মণ্ডলীতে চমৎকার উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। বিশেষভাবে আন্তমাণ্ডলীক ক্ষেত্রে। খুব কম অস্ট্রেলিয়ানই আছেন যারা মাণ্ডলীক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমন প্রভাব ফেলতে পেরেছেন এবং আশা করি সামনের দিনগুলোতেও তিনি মণ্ডলীর নেতৃবর্গকে অনুপ্রাণিত করবেন। এদিকে মেলবোর্ণের আর্চবিশপ পিটার কমেনসলি স্মৃতিচারণ করে বলেন, কার্ডিনাল ক্যাসিডি ছিলেন ঈশ্বর এবং মণ্ডলীর এক বিশ্বস্ত সেবক ও দারুণ অস্ট্রেলিয়ান। বাংলাদেশী অনেক খ্রিস্টভক্তও তাদের প্রিয় এই ব্যক্তিকে হারিয়ে শোক প্রকাশ করছে। ঈশ্বর তাঁর এই মহান সেবককে অনন্ত শান্তি দান করুন।

- তথ্যসূত্র : news.va

ঢাকা সিটি কাথলিক টিচার্স সেমিনার-২০২১

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে অতিথিবৃন্দ

সুমন লেনার্ড রোজারিও ঢাকা শহরের অন্তর্গত বিভিন্ন কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাথলিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে গত ১৩ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টবর্ষে ডায়োসিয়ান এডুকেশন কমিশন 'সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি' শীর্ষক বিষয়ের উপর প্রায় ২০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গনে আয়োজন করে 'ঢাকা সিটি কাথলিক টিচার্স সেমিনার-২০২১'। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুশ ওএমআই মহোদয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও, হিলিং হার্ট কাউন্সিলিং ইউনিট এর ডিরেক্টর সিস্টার লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও এমপিডিএ সহ ঢাকা শহরের অর্ন্তগত বিভিন্ন কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ। সকাল ৯.০০ থেকে দুপুর ৩,০০টা পর্যন্ত চলমান এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজর সম্মানিত অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ, সিএসসি। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সেমিনার শুরুর পর ডায়োসিসান এডুকেশন কমিশনের আহ্বায়ক এবং বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ডের সেক্রেটারী মি. জ্যোতি এফ. গমেজ উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি সবাইকে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম সেন্ট গ্রেগরী পরিবারে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানিয়ে সক্রিয়ভাবে সেমিনারে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। অতপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও ২০২০ খ্রিস্টবর্ষের ৪ অক্টোবর পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন পত্র FRATELLI TUTTI (ফ্রাতেল্লী তুত্তি) অর্থাৎ 'সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি' বিষয়ের উপর চমৎকার এক উপস্থাপনা করেন। তিনি ২৯৮ পৃষ্ঠার এই সর্বজনীন পত্রের ৮ অধ্যায়ের প্রতিটি অত্যন্ত সুন্দর ও সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেন। অতপর আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ ওএমআই মহোদয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আরও একটি চমৎকার সেশন পরিচালনা করেন। তিনি বলেন আন্তঃধর্মীয় সংলাপ হচ্ছে অন্য ধর্ম বিশ্বাসের মানুষের সাথে সহযোগিতার প্রত্যাশায় নিকটে আসা, অন্যের কথা শোনার জন্য এবং তার ধর্মের বিষয় বুঝার জন্য, স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে অন্য ধর্মের ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করা। সেমিনারে সর্বশেষ সেশন পরিচালনা করেন হিলিং হার্ট কাউন্সিলিং ইউনিট এর ডিরেক্টর সি. লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও এমপিডিএ। তিনি ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে করণীয় সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোকপাত করেন। অতপর প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরেন এবং আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুশ ওএমআই মহোদয়সহ অপরাপর আলোচকগণ সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন।

সেমিনার শেষে সকলে পবিত্র ধর্মপল্লী লক্ষীবাজারে পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মধদিয়ে সেমিনার সমাপ্তি ঘটে। প্রদ্বীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি সবাইকে সক্রিয়ভাবে সেমিনারে অংশগ্রহণ করে সেমিনারকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। অতপর সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য পবিত্র ক্রুশ ধর্মপল্লী, লক্ষীবাজারে খ্রিস্টযাগ অর্পন করেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ। পরিশেষে সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্যান্টিনে মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে সেমিনারের সফল পরিসমাপ্তি হয়॥

কুলাউড়াতে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কারিতাসের অধিপরামর্শ সভা

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা কারিতাস সিলেট আঞ্চলিক অফিসের উদ্যোগে এসডিডিবি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে কুলাউড়া কারিতাস সক্ষমতা প্রকল্প অফিসে কুলাউড়া উপজেলার বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কারিতাসের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ টি এম ফরহাদ চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুলাউড়া উপজেলা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) কুলাউড়া উপজেলা, কারিতাস সক্ষমতা প্রকল্পের লিগ্যাল এইড ভাইজার মি. সুবিমল লিন্ডকিরি। তাছাড়া "বাংলাদেশের প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজ কল্যাণ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে অভিগম্যতার সক্ষমতা প্রকল্পের (এসডিডিবি) উন্নয়ন কমিটি, ক্লাব ইউনিয়ন ফোরাম কমিটি, নারী প্রতিবন্ধী ইউনিয়ন ফোরামের কার্যকরি কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ, ১৩ নং কর্মধা ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সংরক্ষিত আসনের (ওয়ার্ড নং ১,২ ও ৩) ইউপি সদস্যা মোছা: লাইলা বেগম উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথি বলেন-'উপজেলা সমাজেসেবা অফিসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকারী শতভাগ বরাদ্দের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা উপবৃত্তির সুযোগ রয়েছে। উপজেলা সমাজসেবা অফিসে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রদান এবং শিক্ষাথ ীদেরকে সমাজসেবা অফিসে যোগাযোগ করতে বলেন। প্রধান অতিথি বলেন-'কারিতাস যে উদ্যোগ নিয়েছে এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন করেছেন। বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রকল্পগুলো বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ভবিষ্যতে কারিতাস এই ধরনের কাজ গুলো অব্যাহত রাখবে এই প্রত্যাশা করি এবং ভবিষ্যতে কোন ধরনের সহযোগিতা বা পরামর্শ প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা সর্বাত্মভাবে সহযোগিতা করব॥

পাইকগাছা চাঁদখালীতে মাদার তেরেসার গির্জার উদ্বোধন

সুজিত মন্ডল ▯ খুলনার জেলার পাইকগাছার চাঁদখালী ইউনিয়নে কাথলিক খ্রিস্টান মিশনের নবনির্মিত "সাধ্বী মাদার তেরেসা" গির্জার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রোজ সোমবার সকালে ক্যাথলিক মিশনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন মহামান্য বিশপ মহোদয় জেমস রমেন বৈরাগী, উপজেলা চেয়ারম্যান আনোয়ার ইকবাল মন্টু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবিএম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী, কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। খুলনা জেলার পাইকগাছা ও জবানদো উপজেলার চাঁদখালী ইউনিয়নের কালিদাসপুর গ্রামে অনেক অনেক বছর ধরে গোলপাতার ঘরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক গির্জা করতো। সেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদে বিশপ মহোদয়ের ও প্যারিস ফাদারের কৃপায় একটি সুন্দর গির্জা নির্মিত হয়। গির্জার নাম দেয়া হয় "সেন্ট তেরেসার গির্জা।" গির্জার উদ্বোধন অনুষ্ঠনে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা থেকে লোক সমাগম ঘটে। আগমন ঘটে বিভিন্ন গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের। হাজার হাজার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় মুসলিম, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদেরও। ৮ ফেব্রুয়ারী তারিখটি চাঁদখালীকে মনে হয়েছিল একখন্ড আনন্দের নগরী॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে সাধু যোসেফের পর্ব পালন

ওয়েলকাম লম্বা ▯ কুমারী মারীয়ার সামী সাধু যোসেফের পর্ব জাফলং সাধু প্যাট্রিকের গির্জায় ১৯ মার্চ, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭:৪৫ মিনিটে পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগের পূর্বে ভক্তজনগণ ক্রুশের পথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করেন। এতে ১জন ফাদার ও ৬০জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। খ্রিস্টযাগের শুরুতে সাধু যোসেফের ছবি নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়।

খ্রিস্টযাগে উপদেশে ফাদার বলেন- এই বছর হল সাধু যোসেফের বছর। এই বছর বিশেষ ভাবে পোপের তিনটি পালকীয় পত্রের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি হল সাধু যোসেফ বর্ষ। আমরা যেন বিশেষভাবে সাধু যোসেফের জীবনী নিয়ে ধ্যান করি তাঁর গুণাবলী আমাদের জীবনে অর্জনের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে পথ চলি। খ্রিস্টযাগের পরে সাধু যোসেফের পর্ব দিনে সকল পুরুষদের ফুলের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা জানান হয়। খ্রিস্টযাগ শেষে যোশুয়া খংস্লিং খাসিয়া ভাষায় সাধু যোসেফের উপর সুন্দর সহভাগিতা করেন। সার্বিক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পালপুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাত ৯ টায় অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন॥

সিলেট ধর্মপ্রদেশে ব্রতধারী-ব্রতধারিনীদের নির্জন ধ্যান ও তৈল আশীর্বাদের খ্রিস্টযাগ

মার্কুস লামিন ▯ গত ২৯ মার্চ, সোমবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ধর্মপ্রদেশের লক্ষীপুর ধর্মপল্লীতে সিলেট ধর্মপ্রদেশে কর্মরত ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের নির্জন ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯:১০ মিনিটে নির্জন ধ্যান শুরু হয় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। প্রার্থনা পরিচালনা করেন ফাদার সুধীর, ওএমআই এর নেতৃত্বে লক্ষীপুর ধর্মপল্লী। বিশপ শরৎ গমেজ 'পবিত্র আত্মায় ব্রকাত্ন হওয়া' এই মূলভাবের আলোকে সহভাগিতা করেন। তিনি পুরাতন ও নতুন নিয়মের আলোকে সুন্দর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন- আমাদের উন্মুক্ত হৃদয় থাকতে হয়, সহজ সরল হতে হয়,পবিত্রতার সাথে যুক্ত থাকতে হয়। সহভাগিতার পর থাকে চা বিরতি। পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করা হয় সেই সাথে থাকে পাপস্বীকারের সংস্কারের ব্যবস্থা। বিকাল ৪ টায় থাকে তৈল আর্শীবাদের খ্রিস্টযাগ। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এই খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করে। খ্রিস্টযাগে ১জন বিশপ, ১৭জন ফাদার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ৪৩জন সিস্টার ও ১৫০জন ভক্তজনগণ অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। ফাদার সুধীর ওএমআই এই খ্রিস্টযাগের তাৎপর্য তুলে ধরেন। বিশপ তার উপদেশ বাণীতে যাজক বরণ সংস্কার ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারের তাৎপর্য তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগের শেষে সিলেট ধর্মপ্রদেশের ডেলিগেট ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া বিশপ মহোদয় এবং সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে সিস্টার শিউলী গমেজ সিএসসি ভক্তজনগণেল পক্ষ থেকে ফাদারদের ফুলের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। ফটো সেশন, মিষ্টিমুখ ও রাতের আহারের মধ্য দিয়ে এই নির্জন ধ্যান ও তৈল আশীর্বাদের খ্রিস্টযাগ সমাপ্ত হয়॥

খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর সংবাদ

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ

সাধু যোসেফের মহাপর্ব পালন

গত ১৯ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বীচিতলা ত্রিপুরা পাড়া সাধু যোসেফের মহাপর্ব ধ্যান, প্রার্থনা, সহভাগিতা ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে মহাপর্ব পালন করা হয়। পর্ব পালনের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ নভেনা প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, উৎসাহ দান ও পর্ব পালনের সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় ভাবে নবপ্রেরণা ও ঐক্যতান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পাড়ার মাষ্টারদের নিমন্ত্রণ ও উপস্থিত থাকতে আন্তরিক ভাবে আহবান জানানো হয়। এর সাথে পার্শ্ববর্তী আগবাড়ীর কারবারী মাষ্টার সহ যুবক-যুবতীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। পর্ব পালনের মূলসুর "পিতৃ হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের পরিবারে একতা, শান্তি ও আর্শিবাদ প্রদান কর" সময়মাফিক সকল বিশ্বাসী ভক্তজনেরা গীর্জায় মিলিত হলে শুরুতে প্রার্থনা অনুষ্ঠান ও সাধু যোসেফের প্রতিকৃতি আর্শিবাদ, মোমবাতি প্রজ্বলন ও ভক্তিভরে বেদীর কাছে উপবেশন করা হয়। প্রারম্ভিক প্রার্থনা শেষে কাটিখিষ্ট দয়ামোহন ত্রিপুরা সাধু যোসেফের গুণাবলী। পরবর্তী সময়ে সিস্টার সেমিতা সিএসসি আর্চডায়োসিসের মূলসুর "আমার মণ্ডলী-আমার হৃদয়, সাধু যোসেফ আমার প্রেরণা" এর উপর ভিত্তি করে সাধু যোসেফ সার্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক এ প্রাসঙ্গিকতা আলোকপাত করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে উৎসর্গ করেন ফাদার রবার্ট গণছালভেস॥

যাজক দিবস ও খ্রিস্টপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা পর্ব

যাজক দিবস ও প্রভু যিশুর শেষ ভোজে পর্ব পালন করা হয় পুণ্য বৃহস্পতিবার ১ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। সকালে মফস্বল ভিত্তিক পাড়ার সকল শিক্ষকগণ, পাড়া প্রতিনিধি ও ফাদার ও সিস্টারগন সহ ৪০জন খ্রিস্টভক্তগণ সকালে সময়মত উপস্থিত হলে খাগড়াছড়ি প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহনের গির্জায় একসাথে মিলিত হয়। যাজক দিবস ও পা ধোঁয়া অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরতে ব্যক্তিগত পাপস্বীকার করা হয়। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভিক শোভাযাত্রায় ঐশবানী বহন, মোমবাতি প্রজ্বলন সহ শোভাযাত্রা শুরু হলে প্রবীণ খ্রিস্টবিশ্বাসী যুধিষ্টির চাকমা ফাদারগনকে যাজক দিবসের সম্মান, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ফুল দিয়ে প্রকাশ করেন। পালপুরোহিতের সাথে যারা সারা বৎসর সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসের শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দিয়ে মন্ডলীতে প্রেরনকাজ সক্রিয়, সতেজ ও জীবন্ত রাখে এদেরকে নিয়ে বারো শিষ্যের পাধোয়া অনুষ্ঠান করা হয়। সবার আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও অংশগ্রহনের মধ্যদিয়ে তিনজন যাজকের সহার্পিত খ্রিস্টযাগ শেষ হলে শিষ্যদের বনরুটি, পবিত্র ক্রুশ, চেইন ও ক্রোকারিজ উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়। এরপর সবাই মিলে দুপুরের আহার ও মিষ্টি খেয়ে অনুষ্ঠান দুপুরের মধ্যেই শেষ হয়। বিকালে সান্ধ্য খ্রিস্টযাগের প্রস্তুতি ও পাড়ায় যাত্রা শুরু হয়। ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি মাটিরাঙ্গা, ফাদার সিলভানুস হেম্ব্রম সাজেক পাড়া ও ফাদার রবার্ট গনসালভেছ আকবাড়ীতে পূন্য বৃহস্পতিবার সান্ধ্যকালীন খ্রিস্টযাগ ও পা ধোয়া অনুষ্ঠান পালন করেন॥

শুভ পুনরুত্থান উৎসব পালিত

পুনরুত্থান উৎসবের পূর্ব প্রস্তুতি হল একসাথে পবিত্র গির্জায় জড় হয়ে প্রার্থনায় মিলিত হওয়া এই কারনে গত ৩০ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে বিশেষ করে বিভিন্ন পাড়ার নারী ও পুরুষদের আহবান করা হয়েছিল, পুনরুত্থান উৎসবের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বৃদ্ধি লাভের দৃঢ় প্রত্যাশায়। পুন্য সপ্তাহের আধ্যাত্মিক জীবন সহভাগিতা ও প্রার্থনায় মিলিত হয়ে পুনরুত্থান উৎসবকে অর্থবহ করা, অংশগ্রহণ সক্রিয় করা ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে পাড়ার মাস্টার, কারবারী ও পাড়ার মণ্ডলীর প্রতিনিধিদের যাজক দিবস ও পুন্য বৃহস্পতিবার স্থানীয় পাল পুরোহিতের সাথে সময় অতিবাহন ও মিলিত ভাবে পা ধোয়ানো, পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে ধর্মপলীতে নিমন্ত্রন করা হয়। পরবর্তীতে পুন্য শুক্রবার পবিত্র ক্রুশের আরাধনা ভক্তিভরে সুনির্দিষ্ট উপাসনার নিয়ম সঠিকভাবে পালন করে সম্ভবপর কয়েকটি পাড়ায় যিশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর পবিত্র উপাসনা পালিত হয়। অতঃপর পুন্য শনিবার কয়েকটি পাড়ায় করোনাকালীন মহামারী ও বিপর্যয় হতে উদ্ধার ও রক্ষা পেতে স্বাস্থ্যবিধি পালন ও সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে নিস্তার জাগরণী উৎসবের আগুন আশীর্বাদ, মোমবাতি প্রজ্বলন, বাপ্তিস্মের প্রতিজ্ঞা নবায়ন ও পবিত্র জল আশীর্বাদ করা হয়। আমাদের কষ্ট ও সাধনা দীর্ঘপথ হেঁটে পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে শুভ পুনরুত্থানের উৎসব পালন করার সার্থকতা হল ক্রমে ক্রমে কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনার সাথে একাত্মতা, আত্মীয়তা ও ধর্ম পালনের আন্তরিকতা। পুনরুত্থান উৎসবে তিনজন পুরোহিত ও সিস্টারগণ পুনরুত্থান উৎসব পালনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে॥

বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ ও শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মার্তিনা সিআইসি বিগত ২০ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রবিবার যিশুর পবিত্র হৃদয়ের গির্জা বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে ৫৫ জন ছেলেমেয়েদেরকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান ও গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা ধর্মপল্লীতে এসে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। শিশুমঙ্গল জড়ো হয়। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০জন। দিবস উদযাপনের জন্য পূর্বের দিন বিভিন্ন রাত্রিতে তারা ১১ দলে বিভক্ত হয়ে বাইবেল

ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে। রবিবারে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার শ্যামল গমেজ এবং সহযোগিতা করেন পাল-পুরোহিত ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী। পবিত্র খ্রিস্টযাগে ফাদার শ্যামল গমেজ প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের সর্বদা পবিত্র থেকে যিশুকে গ্রহণ করতে অনুপ্রেরণা দান করেন এবং যিশুর ভালবাসার পাত্র হতে শিশুদের আহ্বান জানান। খ্রিস্টযাগের পর দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখার জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে র‍্যালী করা হয়। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুদের উদ্দেশ্যে ফাদার শ্যামল গমেজ ও পাল-পুরোহিত ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী তাদের গঠনমূলক উপদেশ রাখেন একই সঙ্গে শিশু পরিচালকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তাদের নিরলস পরিশ্রমের জন্য। অতঃপর দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে দিবসটির শেষ করা হয়॥

গোপালপুর ধর্মপল্লীতে তপস্যাকালীন আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ও যুব সেমিনার

রাতুল রোজারিত ▯ গত ২৭ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের, গোপালপুর স্বর্গোন্নীতা মারীয়া ধর্মপল্লীর মাদার তেরেজা যুব সংগঠন, বিসিএসএম এবং ওয়াইসিএস এর উদ্দ্যোগে প্রায়শ্চিত্তকালীন আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ও যুব সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল: যিশুর পুনরুত্থান, পিতার আশ্রয়ে আমাদের নব জীবন। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপালপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ফ্রান্সিস সরেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার লিপন রোজারিও। ফাদার ফ্রান্সিস সরেন তার বক্তব্যে বলেন, পাপস্বীকার করা আমাদের প্রত্যেকের আত্মার পরিশুদ্ধতার অংশ। আমরা যখন পাপে নিমজ্জিত হই, তখন ঈশ্বরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্নতা হই। সুতরাং পাপস্বীকার করার মাধ্যমে সম্পর্কেও নবায়ন করা দরকার এবং তার মধ্য দিয়ে ক্ষমা গ্রহণ ও প্রদান দুটোর সমন্বয়ে পুনমিলন ঘটে মানুষ ও ঈশ্বরের সাথে। বিশেষ অতিথি ফাদার লিপন রোজারিও যুবক যুবতীদের পাপস্বীকার শোনেন ও তাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। উক্ত সেমিনারে মোট ৩৬ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে যুব সেমিনারের পরিসমাপ্তি ঘটে॥

ধরেন্ডা ধর্মপল্লীতে শিক্ষকদের প্রায়শ্চিত্তকালীন সেমিনার

সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ ▯ গত ২২ মার্চ সোমবার সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী ধরেন্ডাতে অত্র এলাকার তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে খ্রিস্টান শিক্ষকদের নিয়ে তপস্যাকালীন আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি স্বরূপ এক ধ্যানমূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সকাল ৯ টায় সেন্ট যোসেফস্ হাই স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল সিস্টার মেরী নমিতা এসএমআরএ - এর প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু হয়। এর পর পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃ সংঘের প্রদেশপাল ফাদার জেমস্ ক্রুজ পোপের সার্বজনীন পত্র 'FRATELLI TUTTI' এর আলোকে তার মূল উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তিনি পোপের সার্বজনীন পত্রের ১০ টি অধ্যায় খুব সুন্দরভাবে ব্যখ্যা করেন। তবে ১ম অধ্যায়-A dark clouds over a closed world এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়- Dialogue and friendship in society এ দুটি অধ্যায়ের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন,শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। একজন খ্রিস্টান শিক্ষক হিসেবে পুরো মাত্রায় Dedicated হতে হবে। এরপর ফাদার এই পত্রের আলোকে শিক্ষকদের ৩ টি দলে ভাগ করে দলীয় আলোচনার জন্য ২ টি প্রশ্ন দেন, আর শিক্ষকগণও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ও দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। পুরো প্রোগ্রামটি পরিচালনা করেন সেন্ট যোসেফস্ হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী নমিতা এসএমআরএ। এতে ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর মোট ৩৪ জন ক্যাথলিক শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন॥

ড. অগাস্টিন ক্রুজ

ড. অগাস্টিন ক্রুজ এর নতুন চারটি বই এবারের একুশে বই মেলায়

1 DIPLOMATS World, December, 2020

What emerges from these pages is a deep-thinker, a seeker of truth and beauty, imaginative, intuitive, searching for meaning and purpose in the world around him, be it a chance encounter or the wonders of nature.

It is no small matter to venture into the field dominated by such giants as Shakespeare, Wordsworth and T.S. Eliot. Dr. Cruze is to be commended for his courage.

The vision, the insights, the burning questions, the lofty realisations of this seer-poet are worthy of sharing with the English-speaking world. It will undoubtedly benefit from having the opportunity to read his verses.

Shantishri McGrath
Sri Chinmoy Centre, Dhaka

2 I have had the opportunity to read two books of poems by Dr. Augustine Cruze. He writes poetry in both English and Bengali. His poems, of which he is the author of many, are clearly written from the heart. They express vividly human emotions which we all experience-hope, longing, expectation, disappointment, loss, confusion. They are poems with faith as their root and source.

Faith can be challenged, tested. Faith can struggle and question, but faith remains what is held on to.

The poems have imagery taken from nature and world around us. These poems should be read slowly and, when possible, aloud to get the full impact of them.

The author of so many poems would be the first to admit that not all the poems are of equal value and clarity, but many are very fine and moving.

I would recommend his poems as well worth spending time with. They are written from the heart and will speak to many reader's hearts.

Fr. Frank Quinlivan, C.S.C.
English Teacher
Notre Dame University, Bangladesh
Member Board of Trustees.

3 The Daily New Nation
18/05/2018

Dr. Augustine Cruze has endeavored to bring pseudo-political and religious fervor in the gamut weaving Bengali words in rhymes from earth to heaven above. While weaving Bengali words in rhymes it appears that he used to follow Jibanamandio style to some extent using Bengali colloquial and classical words. As a matter of fact his entire idea is likely to be Philosophic. At last he has submitted himself to Almighty entire idea is likely to be confusion regarding socio-religious and political aspects in life on earth that's God willing!

By-
M Mizanur Rahman

4 **সুখবর-সুখবর-সুখবর-** বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবছরও অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বহুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পরমার্থিক দার্শনিক এবং নিভৃতচারী কবি ড. অগাস্টিন ক্রুজ-দর্শনই তাঁর জীবন, দর্শনই তাঁর ভালোবাসা, দর্শন নিয়েই তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড - বিশ্লেষণ করেছেন। ড. অগাস্টিন ক্রুজ- এর এবারের গ্রন্থসমূহ ৪টি বাংলা যথাক্রমে ১) আমি এমন একটা মানুষ পেতাম যদি ২) একটা শেষ নিঃশ্বাসের আয়োজনে ৩) এক ঝাঁক রাজহাঁস ৪) হেঁয়ালি বিধাতা এবং ১ টি ইংরেজি Silent Music কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবির অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ বাংলা যথাক্রমে :- ১) আমার জন্ম হয়েছে বলেই, ২) বিধাতার ইচ্ছে, ৩) এমন যদি হতো ও ৪) তবে তাই হউক, ৫) মহাপরাক্রম, ৬) একটা কোমল গোলাপ, ৭) সব হৃদয়ে ভালোবাসা আছে ৮) আত্মার সন্ধানে ৯) চাবিকাঠি যেন কারো হাতে, ১০) আমি সে স্বর্গ চাই না, ১১) মহাকাল কাঁদিছে অঝোরে, ১২) বিলাস-ভাবনা এবং ইংরেজি যথাক্রমে- 1) Speechless 2) Let Me Be Alone 3) If I Were Not Born. জ্ঞানকোষ প্রকাশনির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি এবারের গ্রন্থ মেলায় ৩৪৮ থেকে ৩৫১ নং স্টলে পাওয়া যাচ্ছে আরো পাওয়া যাচ্ছে ১) জ্ঞানকোষ, ১০-১১ মমতাজ প্লাজা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, ২) কারিতা কর্পোরেশন, নীলক্ষেত, ঢাকা, ৩) জ্ঞানকোষ, ৫-৭ সোবহানবাগ মসজিদ মার্কেট, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ এবং ৪) প্রতিবেশী প্রকাশনী (তেজগাঁও, সিবিসিবি, নারিন্দা এবং লক্ষ্মীবাজার) দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস কবিতাগুলো পাঠকদের মনে দাগ কাটিবে। নিজে বই কিনুন এবং প্রিয়জনকে বই কিনতে উৎসাহিত করুন এবং উপহার দিন।

বিজ্ঞ/১১৩/২১

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের
মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি
জন্ম : ২-০১-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১-০২-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

গত ১ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৭ ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।
আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমারি আদর্শে পথ চলতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ

১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত টমাস রোজারিও
জন্ম : ১১-১২-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬-০৪-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

তুমি আমাদের আপন ভুবন থেকে বিদায় নিয়ে হয়েছ স্বর্গবাসী। তারপরও মনে হয় তুমি আমাদের সাথেই আছ। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমাকে যেন তাঁর কাছে রাখেন। আমরাও যেন তোমার মত আদর্শ জীবনযাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

'দু' লোচনে বারি
ঝরঝর বড় কষ্ট ব্যথায়
কাতর এ হৃদয় প্রাঙ্গণ'

প্রয়াত সিসিলিয়া রড্রিক্স
মৃত্যু : ১৫-০৩-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

ঠাকুমা,
তুমি নেই, এটা এমন সত্যি যে, আকাশের ধ্রুবতারার প্রজ্বলতার আঁচড়েই বুঝা যায়। এতটা বছর পরও তোমাকে হারানোর ব্যথা মনের মাঝে জেগে ওঠে। তোমার স্মৃতি যেন ছবির মত হেসে রয়। দূর থেকে আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মত বিশ্বস্ত হয়ে জগত সংসারে মানুষের সেবা করতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ

২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পরিমল আগষ্টিন রোজারিও
জন্ম : ২৪-০৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০-০৪-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষীবাজার, ঢাকা

বাবা,
বছর ঘুরে আবার এলো সেই বেদনার দিন। যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলে চিরতরে। আমরা ভাবতে পারি না তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার স্মৃতি আজো ভাসে আমাদের মানসপটে। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করো আমরা যেন তোমার মত আদর্শবান মানুষ হতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ
স্ত্রী : হিরণ মারীয়া গরেটি রোজারিও
ছেলে : ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও
ছেলে বৌ : শর্মিলা কস্তা
মেয়ে : পান্না, রাখী, ও রীপা
মেয়ে জামাই : তুষার, জেমস ও সজল
নাতি-নাতীন : স্বপ্নীল, অনিন্দিতা, তীব্র, পূর্ণ, সুপান্থ, অপরাজিতা, প্রিয়, শ্রেয়।

২১তম মৃত্যুবার্ষিকী

"সদা হেসে বলতে কথা,
দিতে না প্রাণে ব্যথা,
মরণের পরে হলে
বেদনার স্মৃতি-গাঁথা"

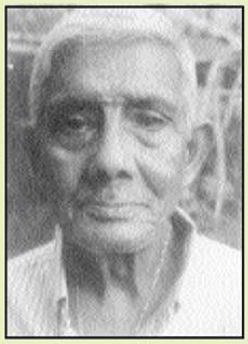

প্রয়াত রায়মন মাইকেল কস্তা
জন্ম : ৪ ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ মার্চ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

দাদু,
১৯ বছর পার হলো, তুমি নেই! তোমার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে প্রতিটি ক্ষণ কাটছে। অম্লান হয়ে আছ তুমি এই আমাদেরই মাঝে। তোমার আদর্শ আর কর্মপ্রেরণার উচ্ছ্বলতা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আশীর্বাদ করো, স্বর্গস্থ পিতার অনন্তধাম হতে আমরা যেন তোমার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারববর্গ

বিজ্ঞ/১১১/২১

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 13
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৩
Regd. No. DA-33
❖ 18 - 24 April, 2021, ৫ - ১১ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ঐশধামে যাত্রার ষষ্ঠ বার্ষিকী

তোমাকে ছাড়া আমরা বড় অসহায়: বেঁচে আছি শুধু তোমার স্মৃতি নিয়ে

প্রয়াত মার্গারেট পেরেরা
জন্ম ঃ ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু ঃ ১২ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে। আমাদের হৃদয় থেকে হারিয়ে যাওনি তুমি। তোমার শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের জীবন চলার পথের পাথেয়। তোমার অস্তিত্ব সবর্ত্র ছড়িয়ে আছে আমাদের জীবন চলার মাঝে।

দেখতে-দেখতে ছয়টি বৎসর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। তুমি যেদিন চলে গেলে সেদিন ছিল ঐশ করুণার পার্বণ দিন। তুমি সরল বিশ্বাসী ছিলে বিধায় ঈশ্বর এমনি একটা বিশিষ্ট পার্বণ দিনে তোমাকে তার কাছে তুলে নিলেন। একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না কোনদিন। তোমার স্মৃতি চির ভাস্বর আমাদের সবার হৃদয়ে। গ্রামবাসীরাও তোমাকে ভুলতে পারেনি। তবে সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে তুমি পরম পিতার ভালবাসার আশ্রয়ে রয়েছ।

তোমার মৃত্যুর মাত্র ১০ মাস ২০ দিন পর তোমার বড় ছেলে (খ্রীষ্টফার সমীর গমেজ) পরপারে চলে যায়। আর তাই তোমার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী ও তোমার বড় ছেলের চল্লিশা একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এত অল্প সময় ব্যবধানে তোমাদেরকে হারিয়ে আমরা বড় নিস্ব ও অসহায় হয়ে পড়েছি।

ব্যক্তিগত জীবনে মার্গারেট পেরেরা খুবই সহজ-সরল-বিনয়ী, কষ্ট সহিষ্ণু, ঈশ্বর নির্ভরশীল ও অতিথিপরায়ন ছিলেন যা এখনও আমরা সদা অনুভব করি। তিনি সেনা সংঘের একজন সদস্যা ছিলেন। নিয়মিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও প্রতিদিন একাধিকবার রোজারি মালা প্রার্থনা করতেন। আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ খবরাদি নেয়া ও তাদের পরিদর্শন তার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। যদিও নিজে তেমন লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, তথাপি সন্তানদের সর্বদাই লেখাপড়ায় অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখেও যেতে পেরেছেন।

স্বর্গধাম থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন শত প্রতিকূলতার মাঝেও তোমার দেখানো আদর্শ পথে আমরা চলতে পারি। প্রেমময় পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই আদরের

মেয়ে-মেয়ে জামাই ঃ লিলি-মন্টু
ছেলে-ছেলে বৌ ঃ প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর-সবিতা, ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ, অমল-অনিমা
নাতি-নাতনি ঃ শংকর-নিপা, সাগর-রিবিকা, সজল-বীথি, সুজন-সিলভিয়া, শৈবাল-ফাল্গুনী, বৃষ্টি-মামুন, অনিক, অমিত, অর্ণব
পুতি-পুতিন ঃ সুজানা, সায়ানা, সামারা, সৃজন, শুভ, দূরন্ত, দুর্জয়

বিজ্ঞ/১১০/২১

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org